boierpathshala.blogspot.com

ছায়া ছায়া ভূত

সায়ন্তনী পূততুন্ড

BOIBAZAR.com

ক্যামোফ্লেজিয়া

১.

হঠাৎ প্রচন্ড জোরে ল্যাবের অ্যালার্ম বেজে উঠলো!

এতক্ষণ ল্যাবরেটরির ভিতরে কোনও আওয়াজ ছিল না। অন্যদিনও বিশেষ থাকে না। শুধু মাঝেমধ্যে টেস্টটিউবের টুংটাং আর বিকারে জল গরম করার খলবল শব্দ অস্ফুট ভাবে শোনা যায়। ভিতরের মানুষগুলো ক্বচিৎ কদাচিত কথা বলে। তাদের কথা বলার সময় কোথায়? সবাই সাদা অ্যাপন পরে কাজ করতেই ব্যস্ত!

আজ সকালেও এমন শান্ত পরিবেশ ছিল। ল্যাবের মুখ্য বিজ্ঞানী ড. হিঙ্গোরানি একটি গোপন আবিষ্কার নিয়ে ব্যস্ত আছেন!ঐ ঘরে সবার প্রবেশ নিষিদ্ধ। একমাত্র ড. হিঙ্গোরানিই প্রাইভেট পাসওয়ার্ড দিয়ে ও ঘর খুলতে পারেন। ব্যাপারটার সাথে ডিফেন্স মিনিস্ট্রি ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলেই এত কড়াকড়ি! এত গোপনীয়তা! নতুন আবিষ্কারটা নিয়ে একাই দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। এমনকি আমাকেও সাহায্য করতে দেননি।

আজও প্রায় সকাল আটটায় এসে সোজা ঢুকে গেছেন নিজের ল্যাবে। আর তার প্রধান অ্যাসিস্ট্যান্ট, ড. অনুপম সেন, তথা আমি আমার নিজস্ব কেবিনে বসে কয়েকটা প্রয়োজনীয় রিপোর্ট তৈরি করছি।

এমন সময়ই অ্যালার্মের পরিত্রাহি চিৎকার! ক্যাঁও...ক্যাঁও করে সমস্ত ল্যাবরেটরিকে চকিত করে তারস্বরে বেজে উঠল!

উপস্থিত সবাই চমকে ওঠে! অ্যালার্ম বাজছে কেন? আওয়াজটা সবচেয়ে বেশি জোরে আসছে ড. হিঙ্গোরানির ল্যাব থেকে!

বুকের ভিতরটা প্রায় লাফিয়ে উঠল! কী হল? ড. হিঙ্গোরানির কিছু হল না তো! নতুন আবিষ্কারটা ঠিক আছে...?

তখন কিছু বলার বা ভাবার মতো অবস্থা ছিল না। সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়েছে ড. হিঙ্গোরানির প্রাইভেট ল্যাবের দিকে! আমার সহযোগী গৌতম উল্টোদিক থেকে পড়িমড়ি করে ছুটে এলো। বেচারা অ্যালার্মের শব্দে ঘাবড়ে গেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে কোনমতে বলে– স্যার...! কী হল? অ্যালার্ম বাজছে...!

কোনমতে উত্তর দিই–জানি না।

–ড. হিঙ্গোরানি... সে ভয়ার্ত ভাবে বলে–ওনার ঘরেই তো অ্যালার্ম বাজছে মনে হয়...

প্রায় দৌড়তে দৌড়তেই জবাব দিলাম–হ্যাঁ, চলো শিগগিরি...দেখি কী হল,..

অন্যান্য দিন ডক্টরের প্রাইভেট ল্যাবের লোহার দরজা পাসওয়ার্ড সিস্টেমে বন্ধ থাকে! আজও তেমনই থাকার কথা। কিন্তু দরজায় হাত রেখেই এক নতুন ট্রেনি গবেষকের ভুরু কুঁচকে গেল।

–ড. সেন... সে একটু ভয় পেয়ে পিছিয়ে এসেছে। তার কণ্ঠস্বরে বিস্ময়– দরজাটা খোলা!

দরজা খোলা! ভাবাই যায় না! এই দরজা দিনে দুবারই খোলে। যখন ড. হিঙ্গোরানি ল্যাবে ঢোকেন তখন একবার, আর যখন বেরিয়ে যান সেফ

তখন! এর মধ্যে ল্যাবের দরজা কোনমতেই খোলা সম্ভব নয়! এ দরজা শুধু পাসওয়ার্ডে খোলে।

আর পাসওয়ার্ড ডক্টর নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না!

কিছু গোলমাল হয়েছে...কী ঘটেছে জানি না...কিন্তু সেই মুহূর্তে একটা ভীষণ অমঙ্গলের ছায়া সবার মুখেই ছাপ ফেলে সরে সরে যাচ্ছিল।

–ড, সেন...স্যার, আপনি দেখুন। গৌতম ফিসফিস করে বলে–আমি সাহস পাচ্ছি না!

সাহস তো আমিও পাচ্ছিলাম না! দরজাটা খোলা দেখেই ভয়ে ঘামছি। ভিতরে রয়েছেন ডক্টর আর তার গোপনীয় ও অমূল্য আবিষ্কার! ঘরে ঢুকে কী দেখবো সেই আশঙ্কায় কাঁটা হয়েছিলাম। তবু...কাউকে তো এগোতেই হবে...!

ভিতরে তখনও ফুলদমে এসি চলছে! চিলড এসির স্পর্শে শরীর ছ্যাঁৎ করে উঠল। চতুর্দিকে সারসার সাজানো কেমিক্যালের শিশি। কাঁচের বাক্সে রাখা স্পেসিমেন। কোনটা কেমিক্যালে ডোবানো। কোনটা আবার এমনিই রাখা!

–ড. হিঙ্গোরানি...ড-ক্ট-র...।

কোন সাড়া নেই! ল্যাবের ভিতরের টিউবটা শুধু দপদপ করে জ্বলার চেষ্টা করছে। কিন্তু পুরোপুরি জ্বলছে না। থেকে থেকে জ্বলছে নিভছে।

আমরা গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেলাম ভিতরের দিকে। ডানদিকে আর বাঁদিকে বইয়ের সেলফ। বইগুলো এলোমেলো ভাবে পড়ে! যেন ওগুলোর উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে!

অথচ এমন হওয়ার কথাই নয়। ডক্টর ভীষণ গোছালো প্রকৃতির। বিশেষ করে বইয়ের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে তিনি ভীষণ খুঁতখুঁতে। তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরির একটু অযত্ন হলেই আমায় পাঁচ কথা শুনিয়ে ছাড়েন। কোন বইয়ের পাতা সামান্য ছেঁড়া দেখলেই সারা অফিস মাথায় তোলেন।

সেই লোকের ঘরে বইয়ের এই অবস্থা!

–ডক্টর.....ডক্টর হিঙ্গোরানি...স্যা–র...!

–অ-নু-প-ম!

এবার উত্তর এলো। কিন্তু একদম অস্বাভাবিক উত্তর! ডক্টরের কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝেছিলাম কিছু একটা হয়েছে। আরেকটু এগিয়ে যেতেই যা চোখে পড়ল তা দেখে আঁৎকে উঠি.....

ডক্টর প্রায় বেহুঁশের মতন পড়ে আছেন মাটিতে। মাথা ফেটে গলগল করে রক্ত পড়ছে।...

–স্যার...স্যার...।

ব্যাকুল হয়ে তাকে ধরে কোনমতে তোলার চেষ্টা করি। ডক্টর নির্জীবের মতো আমার বুকের উপর এলিয়ে পড়লেন। প্রায় সর্বহারার মতো আঙুল তুলে সামনের কাঁচের বাক্সটা নির্দেশ করলেন–ঐ দে–খো!

কী সর্বনাশ! বাক্সটা ফাঁকা! সেখানে ক্যামোফ্লেজিয়া নেই!

২.

–ক্যামোফ্লেজিয়া মিসিং? হাউ ক্যান ইটস পসিবল?

মন্ত্রীর ভুরু দুটো ঠিক শুয়োপোকার মতন দেখাচ্ছিল! মুখে চিন্তার ছাপ প্রকট।

–আমি জানি না। ক্লান্ত স্বরে বলছিলেন ড. হিঙ্গোরানি। মাথায় তিনটে স্টিচ নিয়ে তাকে আরও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ব্যান্ডেজ করা কপালে হাত রেখে চুপ করে বসেছিলেন।

–কীভাবে এরকম হয়? এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটা আবিষ্কার! রেগে গিয়ে বললেন মন্ত্রী–আপনাদের সুরক্ষাপ্রণালীই কাঁচা! এবার আমি উপরমহলকে কী জবাব দেব?

অনেক যুক্তি দিয়েও কিছুতেই তাকে বোঝানো গেল না যে ক্যামোফ্লেজিয়াকে যথেষ্ট কড়া নজরেই রাখা হয়েছিল। ড. হিঙ্গোরানির সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রায় নিশ্ছিদ্রই বলা যায়। তা সত্ত্বেও দুষ্কৃতী কোথা দিয়ে ঢুকল তা বুঝতে পারছি না কেউই।

–এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার! তিনি আরও চটে গিয়ে বলেন–ডিফেন্স মিনিস্ট্রি কয়েক কোটি টাকা ঢেলেছে এটার পিছনে। ড. হিঙ্গোরানি, আপনার কাছ থেকে এটা আশা করিনি।

–হ্যাং ইওর কয়েক কোটি টাকা! এবার ডক্টরের ধৈর্যও জবাব দিয়েছে–আপনি কয়েক কোটি টাকা দেখছেন? কয়েক কোটি মানুষের কথা ভাবছেন না? ওটা কোনও সাধারণ জিনিস নয়। দ্যাট ইজ আ মার্ডার ওয়েপন। আ ভেরি ডেঞ্জারাস ব্লাডি মার্ডার ওয়েপন...এত কোটির দেশে সেটা একবার বাইরে পড়লে কেউ বাঁচবে না। নট আ সিঙ্গল ওয়ান.....বুঝেছেন?

মন্ত্রী কটমট করে ডক্টরের দিকে তাকাচ্ছেন–জানি। তাই তদন্ত দরকার। এভাবে ওটাকে বাইরে ছেড়ে দিতে পারি না আমরা। এ চোর জানে যে

জিনিসটা কোথায় রাখা ছিল। আপনার পাসওয়ার্ড ভেঙে সে ঘরে ঢুকেছে, অথচ এখানকার কোনও স্টাফ, সিকিউরিটি গার্ড কোনও অপরিচিত ব্যক্তিকে ঢুকতে বা বেরোতে দেখেন নি।

সবাই একসঙ্গে মাথা নাড়ল।

–তাহলে সে কোন বাইরের কেউ নয়। ঘরেরই লোক। এই ল্যাবেরই কোন কর্মী। মন্ত্রীজি আমাদের সবার দিকে রক্তচক্ষু করে তাকালেন–আপনারই কোন লোক!

একেই অমন মারাত্মক জিনিসটা চুরি যাওয়ার আতঙ্ক তো ছিলই। তার উপর আবার নতুন আপদ জুটল! সন্দেহ!

ক্যামোফ্লেজিয়া জিনিসটা বারদুয়েক স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। একটা সামান্য ঘাসফুলের মতো দেখতে জিনিসটাকে। কেউ দেখলে ভাববেই না যে জিনিসটা অমন মারাত্মক!

ঘাসফুলের একটি প্রজাতির জেনেটিক কোড বেক করে বিশেষভাবে ডিএনএ তৈরি করার পর ক্যামোফ্লেজিয়া জন্মেছে। মূল ফর্মুলাটা গুপ্ত। ড. বিবেক টোডি, ড. হিঙ্গোরানি ও ড. সুকুমার বসু ছাড়া আর কেউ জানে না। জিনিসটা তৈরি হওয়ার পর একঝলক দেখেছিলাম। সাদা ধবধবে ছোট্ট একটা ফুল। ঘাসফুলই বলা যায়। কিন্তু তিন বৈজ্ঞানিক

বলেছিলেন যে, যতই নিরীহ হোক না কেন–এ ফুল মারাত্মক। এ ফুলের গন্ধ এতটাই বিষাক্ত যে একটা ফুলই দশটা মানুষ মারার পক্ষে যথেষ্ট। অ্যাকোনিটামের বিষাক্ত ডিএনএ-র সাথে মিলিয়ে যেহেতু তৈরি তাই এর গন্ধে অ্যাকোনাইটের মত মারাত্মক বিষ আছে! একবার নাকে গেলে রক্ষা নেই। কোমা অবধারিত! এবং পরে মৃত্যু।

ক্যামোফ্লেজিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক বৈশিষ্ট্য যে এটি রঙ পাল্টাতে পারে! এটা কী করে করলেন তিন বৈজ্ঞানিক তা জানা যায়নি। কিন্তু ক্যামোফ্লেজিয়ার ডেমোনস্ট্রেশনের সময়েই দেখেছি যে এই ফুলটা অদ্ভুতভাবে রঙ পাল্টায়!

প্রথমবার যখন দেখি তখনই প্রায় চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গিয়েছিল! ভাবতেই পারিনি যে এমনও হতে পারে! ডেমোনস্ট্রেশনের আগেই কনফারেন্স হলে উপস্থিত ছয় দর্শককে গ্যাস মাস্ক পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে নাকে গন্ধ না যায়! সেই ছ'জনের মধ্যে আমিও ছিলাম। বাকি পাঁচজন ডিফেন্স মিনিস্ট্রির হোমরা চোমরা।

দর্শকাসনে বসেই বিস্ফারিত চোখে দেখলাম ড. হিঙ্গোরানি একটা গিনিপিগের বাক্সে ক্যামোফ্রেজিয়া রেখে দিলেন! এক মিনিটও লাগল না! গিনিপিগগুলো পটাপট মরে গেল!

শুধু এইটুকুই নয়, ডক্টর ফুলটা হাতে তুলে নিয়ে তার পেছনে একের পর এক রঙের জিনিস রাখতে লাগলেন। কখনও ব্যাকগ্রাউন্ডে কালো, কখনও নীল, কখনও লাল!

আমরা বোকার মতো হাঁ করে দেখলাম ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে রঙ পাল্টাচ্ছে ক্যামোফ্লেজিয়া! একদম মিশে যাচ্ছে পেছনের জিনিসটার সাথে!

এ এক অদ্ভুত অস্ত্র। একরাশ যে কোন ফুল, গাছ বা অন্যকিছুর মধ্যে একটা রেখে দিলে সেটাকে কেউ আলাদা করে চিনতেই পারবে না। রঙ পালটিয়ে সে মিশে যাবে পিছনের বস্তুটির সাথে। এবং সেখান থেকেই বিষ মাখা সুগন্ধ দিয়ে যাবে এই অদৃশ্য ফুল। তার সামনে বসে থাকা হতভাগা জীবটি বুঝতেও পারবে না যে কখন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ছদ্মবেশী শমন! বোঝার আগেই শেষ!

ডিফেন্স মিনিস্ট্রির লোকেরা উঠে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিল ডক্টরকে। কিন্তু আমি ভয় পেয়েছিলাম! ভেবেছিলাম–এইরকম ভয়ঙ্কর অথচ নিরীহ চেহারার মারণাস্ত্র তৈরি করে কি সর্বনাশই না করলেন ডক্টর! কত নিরীহ মানুষের প্রাণ নেবে এই সাধারণ চেহারার ছদ্মবেশী ফুল, ক্যামোফ্লেজে সিদ্ধহস্ত–ক্যামোফ্লেজিয়া!

কিন্তু ডিফেন্স মিনিস্ট্রির কাছে হস্তান্তরিত হওয়ার আগেই লোপাট হয়ে গেল। ক্যামোফ্লেজিয়া। সঙ্গে সঙ্গেই গোপনে চলল কড়া তদন্ত। আমাদের সবার বাড়ি তোলপাড় করে সার্চ করা হল। কিন্তু কারুর বিরুদ্ধেই কিছু পাওয়া গেল না।

তখন অন্য রাস্তা ধরল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। প্রতিটা দূতাবাসে খোঁজ রাখল, সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের ফলো করল। সেখানেও কিছুই পাওয়া গেল না। শুধু একটা ব্যাপারে আশ্বস্ত হল তারা। ক্যামোফ্লেজিয়া যে চুরি করেছে, সে সেটা অন্য কোনও দেশকে বিক্রি করার জন্য চুরি করেনি। হয়তো তার অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে।

কিন্তু কী?

৩.

উদ্দেশ্যটা বুঝতে অবশ্য একসপ্তাহও সময় লাগল না!

প্রথমেই মারাত্মক কার্ডিয়াক অ্যাটাকে মারা গেলেন ড. বিবেক টেডি!

তখনও ব্যাপারটাকে অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়নি। হৃদযন্ত্রের সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। বয়েসও হয়েছিল। তার উপর ডাক্তারদের বারবার বারণ করা সত্ত্বেও অ্যালকোহলের নেশাকে অতিক্রম করতে পারছিলেন না। তাই তার মৃতযুটা খুব আশ্চর্যজনক কিছু নয়। দুঃসংবাদটা শুনে আঘাত পেয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু বিস্মিত হইনি।

কিন্তু ড. সুকুমার বসুও যখন হঠাৎ একদিন তার বাড়িতেই পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন, তখন ব্যাপারটা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। ড.

বসুকে নার্সিংহোমে ভর্তি করা হলে ডাক্তাররা বলল যে তিনি কোমায় আছেন। সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া এবং সঙ্গে ভয়ানক ভেন্ট্রিকলার অ্যারিদমিয়াস।

এই সবগুলো লক্ষণ শুনেই বুকের ভিতরটা কেমন কেমন করতে লাগল। এর সবকটাই অ্যাকোনিটামের লক্ষণ! মন বলতে লাগল–এ ঠিক সমাপতন নয়! এর পিছনে গুরুতর কোন চক্রান্ত আছে। ক্যামোফ্লেজিয়ায় অ্যাকোনিটামের পার্সেন্টেজ যথেষ্ট!

প্রথম মৃত্যুটাকেও তখন আর স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল না আমাদের। ড. বিবেক টোডি ও ড. বসু–দুজনেই এমন মারাত্মকভাবে হৃদযন্ত্রের অসুখে আক্রান্ত হলেন! তাও মাত্র তিনদিনের ব্যবধানে! কী করে হতে পারে? এ কি নিতান্তই কাকতালীয়? না অন্য কিছু? দুজনেই ক্যামোফ্লেজিয়ার আবিষ্কারে যুক্ত ছিলেন। এই দুজন আর ড. হিঙ্গোরানি–এই তিনজনই তার জন্মদাতা। মূল ফর্মুলাটা এরাই জানেন। তারপর আর কেউ যদি সামান্য কিছুও জেনে থাকে, সে আমি! প্রথম তিনজনকে সরিয়ে দিতে পারলে এই মারাত্মক অস্ত্রটি দ্বিতীয়বার আর আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সেক্ষেত্রে যে চুরি করেছে, তার কাছে ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না ক্যামোফ্লেজিয়ার নমুনা! সমস্ত বৈদেশিক শক্তি, তার সাথে ভারতও টাকার থলে নিয়ে তার পেছনে অসহায়ের মত ছুটবে।

বেশ বুঝতে পারছি যে এ আমাদের মধ্যেই কারুর কীর্তি। কিন্তু কে? কে হতে পারে? এখানে প্রথম তিনজনের পরই আমার স্থান। আমি নই। তবে? গৌতম...?

কয়েকদিন গৌতমকে খুব চোখে চোখে রাখলাম। কিন্তু তেমন কিছুই চোখে পড়ল না। সে স্বাভাবিকভাবেই কাজ করছে। এবং যতদূর জানি এতবড় দুঃসাহসিক কাজ করার সাধ্যও তার নেই। সত্যি বলতে, এ অফিসের কারুর আদৌ আছে কিনা সন্দেহ!

তবু কেন জানি না কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। যাকেই দেখছি, মনে হচ্ছে, এই সে নয় তো!

থাকতে না পেরে একদিন ড. হিঙ্গোরানিকে কথাটা বলেই ফেললাম। মনে হচ্ছিল স্যারকে সতর্ক করাটা সত্যিই দরকার।

ড. হিঙ্গোরানির টেবিলের উপর একটা ফুলের বোকে রাখা ছিল। সম্ভবত গোলাপ ফুলের। তিনি আমায় একটা গ্যাস মাস্ক এগিয়ে দিয়ে বলেন– পরে নাও অনুপম, গোলাপের গন্ধে তো তোমার আবার মারাত্মক অ্যালার্জি হয়। এইমুহূর্তে তুমিই আমার ডানহাত। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে মুশকিল।

গোলাপের গন্ধে সত্যিই আমার ভয়াবহ অ্যালার্জি। তাই বিনাবাক্যব্যয়ে গ্যাস মাস্ক পরে নিই।

–হ্যাঁ, বলো কি বলছিলে?

নিজের থিওরি ও সন্দেহের কথা স্পষ্ট করেই বললাম। শুনতে শুনতে ভুরু কুঁচকে গেলো তাঁর। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেমে থেকে বললেন–তোমার সন্দেহ সঠিক কিনা জানি না। ড. বসু এখনও কোমায়। কিন্তু দুজনের ক্ষেত্রেই অ্যাসফিক্সিয়া বা অক্সিজেন ডেফিশিয়েনসির লক্ষণ দেখা গেছে। তোমার কথা। উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

–সেক্ষেত্রে স্যার, আপনার সাবধান হওয়া উচিৎ।

তিনি সরু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকান–শুধু আমারই নয়, তোমারও সাবধানে থাকা উচিৎ অনুপম।

–আমি! অবাক হয়ে বলি–কিন্তু আমি তো খুব অল্পই জানি এ সম্বন্ধে!

–সে তো তুমি আর আমি জানি। ডক্টর শান্তভাবেই বললেন–কিন্তু যার মাথায় একাই ঐ আবিষ্কারের পেটেন্ট নেওয়ার দুর্বুদ্ধি ঘুরছে সে তো জানে না। তুমি আমার মেইন অ্যাসিস্ট্যান্ট। ডানহাত যাকে বলে। আমার পরে তোমারই তো সব জানার কথা। পুরোটা না জানলেও অল্পবিস্তর তো জানোই। তোমায় ছেড়ে দেওয়ার ঝুঁকি কি সে নেবে?

এ কথাটা আগে মাথায় আসেনি। ড. হিঙ্গোরানি বলার পর মেরুদণ্ড বেয়ে যেন একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। সত্যিই তো!

–এসব নিয়ে মাথা ঘামিও না অনুপম। তিনি সহজভাবেই বলেন– এটা সেফ একটা কো-ইনসিডেন্স, আই হোপ।

আই হোপ–শব্দটার মধ্যে তেমন জোর পাওয়া গেল না!

উনি যত সহজে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলেন,আমি কিন্তু তা পারলাম না।

ওনার বলা শেষ কথাগুলো বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল। সত্যিই তো! আমাকেও কি ছাড়বে ঐ অজানা আততায়ী? ড. টোডি, ড. বসু ও ড. হিঙ্গোরানির পর তো আমিই একমাত্র মানুষ যে ক্যামোফ্লেজিয়া সম্পর্কে সামান্য হলেও খবর রাখে। অন্তত ক্যামোফ্লেজিয়াটা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। দেখেছি সেটা কীভাবে কাজ করে। তার সাথে এ ও জানি যে জিনিসটার এফেক্ট মানব শরীরে কী হয়, সিম্পটমগুলো ও মিক্সড ভেনামের নামটাও জানি।

গাড়িতে যেতে যেতেই বারবার কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরছিল। বাড়িতে পৌঁছেও দুশ্চিন্তাটা মাথা থেকে গেল না।

আমার বাড়িটা বেশ বাংলোবাড়ির মত করে সাজিয়েছি। ছোট্ট সুন্দর লালটালি বসানো দোতলা বাড়ি। লাল টালিগুলো আমারই পছন্দ করে কেনা। সামনে ছোট্ট একটা বাগান। মালির যত্নে বেশ ঝকঝকে চকচকে

হয়ে উঠেছে। বোগেনভিলিয়ার ঝাড়ে, নানান বিদেশী ফুল, লতায়, মশে রঙিন হয়ে উঠেছে! ভেলভেটের মতো ঘাসের সবুজ রঙে পান্নার ঔজ্জ্বল্য! দুদিকে দুটো ঝাউগাছ মালির যত্নে একদম নিখুঁত আকারে রাজার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রোজ বাড়িতে ঢোকার সময়ে এই বাগানটার দিকে তাকালেই মন ভালো হয়ে যায় আমার। কিন্তু আজ...

আজ ভয় হল!

কে বলতে পারে, এই বাগানেই কেউ একটা ক্যামোফ্লেজিয়া রেখে যায় নি। ডক্টর হিঙ্গোরানির কাছে এ ও শুনেছি যে এই স্পেশিজটা খুব তাড়াতাড়ি বংশবৃদ্ধি করে। মাত্র একসপ্তাহের মধ্যেই সে প্রায় একটা গোটা ব্যাটেলিয়ন তৈরি করে ফেলতে পারে। অসম্ভব শক্তিধর এই আবিষ্কার!

কোনওদিন এত খুঁটিয়ে বাগানটাকে দেখিনি। আজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম। নাগ কেশরের ঝাড় রীতিমতো ফুলেফেঁপে উঠেছে। পাশে স্পাইনি অ্যাকান্থাস আর ফায়ারস্পাইক ফুটে রয়েছে। ইচ্ছে ছিল অ্যান্থোনিয়ামও রাখবো গ্লাসহাউস করে। কিন্তু ফুলগুলো বাঁচেনি।

আমার গোলাপের গন্ধে অ্যালার্জি। তাই গোলাপের কোনও প্রজাতিকেও রাখিনি। এছাড়া আরও বিভিন্ন ফুলে, গোলাপি, হলুদে, লালে জমকালো হয়ে উঠেছে আমার বাগান।

আজ ফুলের সৌন্দর্য দেখার মানসিকতা ছিল না। আমার সন্ধানী চোখ। আঁতিপাতি করে খুঁজছিল রঙীন ফুলের মধ্যে একটা ছোট্ট বিশেষ ফুলকে। রঙের বিষয়ে সঠিক ভাবে বলা মুস্কিল। হয়তো সে পুরোপুরি বেগুনী হয়ে মিশে গেছে। ডেজার্ট পিটুনিয়ার ভিড়ে। অথবা গোলাপি হয়ে আইসপ্ল্যান্টের মধ্যে চুপ করে লুকিয়ে বসে আছে। কিছু বলা যায় না...কিচ্ছু বলা যায় না.....! ক্যামোফ্লেজিয়ার পক্ষে সবই সম্ভব!

প্রায় গরুখোঁজা খুঁজতে খুঁজতেই হঠাৎ চোখে পড়ল ঘাসের ফাঁকে ছোট ছোট সাদা ফুল!

ঘাসফুল! না.....

টের পেলাম হঠাৎ করেই বুকের ভিতরটা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। এতগুলো ঘাসফুল কবে আমার বাগানে ফুটল? আগেই ফুটেছিল? না এখন.....? আজকেই...?

–প্রতাপ...প্র-তা-প!

নিজের কণ্ঠস্বরকেই আর তখন চিনতে পারছি না। গলা দিয়ে প্রায় আওয়াজ বেরোচ্ছিল না। তাই চেঁচিয়ে ডাকতে গিয়ে নিজের কানেই নিজের গলা ভীষণ কর্কশ শোনালো!

আমার তারস্বরে চিৎকার শুনে প্রতাপ প্রায় দৌড়তে দৌড়তে আসে। আমায় এইভাবে চেঁচাতে ও আগে কখনও দেখেনি। রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েই সে ছুটে এসেছে।

— স্যার,... সে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। এত ফুলের ভিড়ে দাঁড়িয়ে তার স্যার কেন অমন আর্তনাদ করছেন তা বোধহয় বুঝে উঠতে পারেনি।

–এগুলো কী? আমি তখন ঘামছি। কোনমতে আঙুল তুলে ছোট ছোট সাদা ফুলগুলোকে দেখাই।

সে অবাক–ঘাসফুল স্যার!

–ঘাসফুল! কী করবো ঠিক করতে না পেরে ওর উপরই রেগে যাই–এ বাগানে ঘাসফুল কেন?

–স্যার... প্রতাপ থতমত খেয়ে কিছু বলতে যায়। কিন্তু তার আগেই ওকে থামিয়ে দিয়েছি–এখুনি কেটে ফেলো। এক্ষুনি... ইমিডিয়েটলি... এখানে আর একটাও ঘাসফুল দেখতে চাই না আমি।

ভ্যাবলার মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে মাথা নাড়ল।

–আর...হ্যাঁ...ও গুলো হেঁটে ফেলার আগে মুখে মাস্ক পরে নেবে। নাকে যেন গন্ধ না যায়। বুঝেছ?

আমি আর ওখানে দাঁড়াই না। মোরাম বিছানো পথ দিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে দেখি, প্রতাপ কিছুক্ষণের জন্য হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এককোণের স্টোররুম থেকে কাটারি নিয়ে এলো। আমার কথা অবজ্ঞা করেনি। গামছা দিয়ে নাক মুখ পেঁচিয়ে বেঁধেছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। প্রতাপ কী ভাবল কে জানে। হয়তো ভাবল স্যারের মাথায় ছিট! যাই ভাবুক। ঐ ফুলগুলো তো আর ওখানে থাকবে না!

ঘরের তালা খুলে ভিতরে ঢুকতেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ! সবসময় বন্ধ থাকলে যা হয় আর কি! সকালে চাউমিন খেয়ে বেরিয়েছিলাম। তার সসের গন্ধ এখনও নাকে ঝাপ্টা মারছে।

ভীষণ বিরক্ত লাগল। আমার কাজের লোক–মদন, এক নম্বরের ফাঁকিবাজ! আমিও বেরিয়েছি, অমনি সেও জানলা দরজা বন্ধ করে পাড়া ঘুরতে বেরিয়েছে। দিনভর খালি এখানে-ওখানে টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। অবশ্য আমার ফেরার আগেই সচরাচর ফিরে আসে।

আজ তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। ফলস্বরূপ মদনের দেখা নেই!

অগত্যা আপনা হাত-জগন্নাথ! প্রথমেই জানলাগুলো সব খুলে দিলাম। তাকের উপর রুমফ্রেশনারটা ছিল। স্প্রে করতে গিয়ে দেখি ফসফস আওয়াজ হচ্ছে! ওটা শেষ!

এমন সময়ই শেষ হতে হল! বাধ্য হয়েই আমার দামী পারফিউমটা স্প্রে করে দিলাম। অন্তত এই অসহ্য ভ্যাপসা গন্ধটা তো যাবে! মনে মনে তখন মদনের পূর্বপুরুষের শ্রদ্ধ করে চলেছি। আশ্চর্য! রুমফ্রেশনারটা যে শেষ হয়ে গেছে, সেটাও তার খেয়াল নেই। নতুন কিনে আনা তো দূর! এত টাকা দিয়ে ওকে রেখেছি কেন আমি? পরের বাড়ির ঝিয়ের সাথে গল্পগুজব করার জন্য?

মনে মনে গরম হয়ে উঠি। একবার ফিরুক হতভাগা–তারপর ওর হচ্ছে!

ভীষণ খিদে পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি কোনমতে গায়ে দু মগ জল ঢেলে এলাম। শরীর আর মাথা তো ঠাণ্ডা হল। কিন্তু পেটের ভিতরে ইঁদুরের রেস চলছে! মদন কখন ফিরবে তার ঠিক নেই। তাই নিজের হাত পুড়িয়েই কিছু বানিয়ে নিতে হবে। ফ্রিজে হয়তো এক দু টুকরো বেড এখনও আছে। তার সাথে ডিমের একটা ওমলেট আর চা যথেষ্ট!

রান্নাঘরে ঢুকে বুঝলাম যে কাজটা যতটা সহজ মনে হচ্ছিল, ঠিক ততটা নয়। ফ্রিজ থেকে পাঁউরুটি আর ডিম উদ্ধার করা গেলেও চায়ের পাতা, চিনি কোথায় রাখা থাকে কিছুই জানি না! তাকের উপর সারিসারি শিশি।

তার কোনটায় চিনি, কোনটায় নুন, কোনটায় কি, সেসব সম্পর্কে কোন জ্ঞানই নেই। নিজের কিচেনের চেয়ে বরং ল্যাবরেটরিটা আমার কাছে অনেক বেশি চেনা!

প্রায় অসহায়ের মতই তন্ন তন্ন করে খুঁজছি সব উপকরণ। খুঁজতে খুঁজতেই রান্নাঘরের ঠিক জানলাটার সামনে এলাম।

ঠিক তখনই...

...একটা অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ নাকে এলো!

অদ্ভুত মিষ্টি একটা গন্ধ!...এমন গন্ধ তো আগে কখনও পাইনি! কেমন যেন নেশা ধরানো সুবাস...।

আমার ইন্দ্রিয়গুলো সব সতর্ক হয়ে উঠল। এটা কিসের গন্ধ?...রান্নাঘরের জানলা দিয়ে ফুরফুর করে হাওয়া আসছে। তার সাথে সাথেই গন্ধটা ঝাপ্টা মেরে ঢুকে পড়ছে। খুব তীব্র নয়...কিন্তু...

ক্যামোফ্লেজিয়ার গন্ধ কেমন তা জানি না। ডেমোনস্ট্রেশনের সময়ে নাকে মাস্ক পরেছিলাম। কিন্তু শুনেছি গন্ধটা মিষ্টি।...

গন্ধটা কি এইরকম?...কিসের গন্ধ এটা...?...ক্যামোফ্লেজিয়া...?

–প্রতাপ..প্র–তা–প!

প্রায় মৃত্যুভয়েই আর্তচিৎকার করে উঠেছি। বুকের ভিতরটা কেমন কেমন করছে। একটা বিরাট টারবাইনের মতো ধপ ধপ করে চলছে! ভীষণ রকমের আকুলি বিকুলি! বোধহয় এখনই হার্টফেল করবো...আর সময় নেই...সেই মারাত্মক মারণাস্ত্র আজ আমায় শেষ করেই ছাড়বে!

–স্যার...স্যার...

প্রতাপ বোধহয় ঘাসফুল পরিষ্কার করতেই ব্যস্ত ছিল। চিৎকার শুনে কাটারি হাতেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে এসেছে।

–কী হয়েছে স্যার...?

ভয়ে গলা কাঁপছে। কোনমতে বললাম–ওটা কীসের গন্ধ?

প্রতাপ জোরে জোরে বেশ কয়েকবার নিঃশ্বাস নিয়ে গন্ধটা শুকল। আমি প্রায় দমবন্ধ করে রেখেছি। কিছুতেই ওই বিষ নিঃশ্বাস নেবো না আমি...কিছুতেই না!

–ওঃ... সে গন্ধটা অনুধাবন করেই হেসে ফেলেছে–এটা তো জুঁইফুলের গন্ধ।

–জুঁইফুল! আমি নিঃসন্দেহ হতে পারি না। কে বলতে পারে–ক্যামোফ্লেজিয়ার ডিএনএ গঠনে হয়তো উঁইফুলের অবদানও আছে! হয়তো তার গন্ধটা উঁইফুলের মতোই!

–জুঁইফুলের গন্ধ! এখানে সুঁইফুলের গন্ধ কোথা থেকে আসবে?

প্রতাপ আমার অবস্থা দেখে অবাক হয়। আস্তে আস্তে বলে–আপনার মনে নেই স্যার? আপনিই তো চারাগাছটা নিয়ে এসেছিলেন। বাগানে জায়গা ছিল না বলে রান্নাঘরের পিছনেই লাগিয়েছিলাম আমি...

–কেটে ফেলো।

সে বোধহয় আমার কথার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারল না। কেমন বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় বুঝতে পারছে না যে কি করবে।

–একদম গোড়া থেকে কেটে ফেল। আমি জোরালো গলায় বলি–ছুঁইফুলের গাছ চাই না আমার। একদম উপড়ে ফেল। এই গন্ধ যেন আর আমি না পাই।

সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

–ঘাসফুলগুলো সব ঘেঁটে দিয়েছ?

–হ্যাঁ।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি–ঠিক আছে...এটাকেও...

–ঠিক আছে স্যার।

প্রতাপের মুখ বিষণ্ন। বাগানের প্রত্যেকটা ফুল, গাছ তার বড় প্রিয়। বড় যত্নে, প্রায় সন্তানের মতো করেই সে বড় করে তুলেছে প্রত্যেকটা গাছ। আর আজ তাকেই আমি সেগুলো কেটে ফেলার নির্দেশ দিচ্ছি!

মনে হল ওকে কষাই এর কাজ দিয়েছি। একবার মনে হল ডেকে বারণ করে দিই। পরক্ষণেই মনকে বোঝাই...।...কেউ বলতে পারে না...কেউ বলতে পারে না...হয়তো এই নিরীহ ফুলের মধ্যেই নিরীহতর মুখ করে বসে আছে ক্যামোফ্লেজিয়া! আমায় শেষ করার মতলবে বিষ সৌরভ ছড়াচ্ছে!

তখনও হাত পা কাঁপছিল। কোনমতে আবার বসার ঘরে ফিরে আসি। আজ আর রান্না করার মতো অবস্থা নেই। কোনমতে শুকনো পাঁউরুটি আর জল খেয়েই চালাতে হবে।

কিছুক্ষণ বসে থাকার পর মনে হল একটু ধাতস্থ হয়েছি। আস্তে আস্তে উঠে ল্যাপটপটাকে নিয়ে এলাম। অনেক কাজ পড়ে আছে। ড. হিঙ্গোরানির জন্য কিছু প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। ডক্টর কাজে গাফিলতি একদম বরদাস্ত করেন না।

ফ্রিজে নতুন একটা হুইস্কির বোতল ছিল। আমি সচরাচর খুব টেনস না হলে ড্রিঙ্ক করি না। কিন্তু আজ একটা ড্রিঙ্ক নিজেই বানিয়ে নিয়েছি। যে অবস্থায় আছি তাতে একটু অ্যালকোহল পেটে না পড়লে কাজ হবে না।

ল্যাপটপে একমনে কাজ করতে করতে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। কখন যে বাইরে ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে তা খেয়াল নেই। হুইস্কির প্রভাবে হোক, বা অন্য যে কোনও কারণে, ক্যামোফ্লেজিয়ার কথা মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। হুঁশ ফিরল মদনের ডাকে–

–বাবু!

আগে ভেবেছিলাম ও এলে একচোট বকাবকি করব। কিন্তু এখন সে ইচ্ছেটা আর টের পেলাম না।

–আপনি আজ তাড়াতাড়ি ফিরেছেন! সে একহাত জিভ কাটে– কিচু খান নি নিশ্চই!

আমি শান্ত গলায় বলি–খেয়েছি।

সে আবার জিভ কাটল। কার উদ্দেশ্যে কে জানে–রাত্তরে কী খাবেন বাবু?

–রুটি কর। একটু ভেবে জবাব দিই–আর ডিম কষা হলেই চলে যাবে।

–আচ্চা। ও চলে যাচ্ছিল। আমি পিছন থেকে ডাকি– শোন...

–হ্যাঁ বাবু।

–রুম ফ্রেশনারটা শেষ হয়ে গেছে। দোকান থেকে একটা নিয়ে আসিস্।

–অকে...।

'অকে' টা 'ওকে' এর মদনীয় সংস্করণ। আমাকে প্রায়ই 'ওকে' বলতে শোনে। সেখান থেকেই রপ্ত করেছে।

মদন চলে গেল রান্নাঘরে। আমি আবার কাজে মন দিলাম। প্রোজেক্ট রিপোর্ট শেষ করতে করতেই রাত দশটা বাজল। তারপর কয়েকটা ই-মেল পাঠালেই আজকের মতো কাজ শেষ!

ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটার ঘন্টা পড়ছে। আমি প্রায় ল্যাপটপের মধ্যে মাথা খুঁজে ই-মেল টাইপ করছি, ঠিক তখনই মোবাইল ফোনটা তীব স্বরে বেজে উঠল।

একটু বিরক্ত হলাম। কাজের সময়ে ফোন বাজলে ভীষণ বিরক্ত লাগে। এখনও সাতটা ই-মেল পাঠাতে হবে আমায় দেশ-বিদেশের নানা বিজ্ঞানীকে। লম্বা লম্বা বয়ানের চিঠি। সময় লাগবে। তার উপর একটাও স্পেলিং মিস্টেক হওয়া চলবে না। একটা বানান ভুল হলেও ডক্টর আমায় বকাবকি করে রাখবেন না। যথাসম্ভব সতর্ক হয়ে কাজ করছি।

এমন সময় কে আবার জ্বালাতে ফোন করল?

প্রথমে ভেবেছিলাম ফোন ধরবো না। কিন্তু আড়চোখে তাকিয়ে দেখি ফোনের ডিস প্লে তে জ্বলছে নিভছে–কলিং গৌতম!

আমার মনে একটা তীব্র আশঙ্কা উন্মত্তের মত নাচতে শুরু করল। গৌতম এখন ফোন করছে কেন? সচরাচর সে খুব একটা ফোন করে

না। যা কথা হওয়ার তা ল্যাবেই হয়। আজও বেরিয়ে আসার আগে ওকে সমস্ত কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি। ড. হিঙ্গোরানি ল্যাবে আছেন। আমি আজ একটু তাড়াতাড়ি চলে এসেছি বলে ওকে ডিউটিতে থাকতে হয়েছে।

কিন্তু সে ফোন করছে কেন? আবার কী হল?

তাড়াতাড়ি ফোনটা ধরি—

–হ্যালো।

ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এলো গৌতমের ভাঙা ভাঙা উত্তেজিত স্বর–স্যার?

–বলছি, বলো।

ঠিক হাহাকারের মতো শোনালো তার কথাগুলো–

–ড. হিঙ্গোরানি ল্যাবে কাজ করতে করতেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অসম্ভব ব্রিদিং ট্রাবল। নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না। আমি ওনাকে লাইফকেয়ার নার্সিংহোমে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি ইমিডিয়েটলি চলে আসুন।

আমার ব্রহ্মতালু থেকে পায়ের নখ অবধি যেন বরফ হয়ে গেল! হাতটা ভীষণ অবশ লাগছে। ফোনটা ঠক করে হাত থেকে পড়ে গেল মেঝেতে!

ব্রিদিংট্রাবল……না…আবার ক্যামোফ্লেজিয়া!!!

৪.

লাইফকেয়ারের আইসিইউতে গভীর কোমায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন ড. হিঙ্গোরানি। ভেন্টিলেশন চলছে। ডাক্তারবাবু প্রথমে ভিতরে কাউকে অ্যালাউ করছিলেন না। অনেক কাকুতি মিনতির পর আমাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য কাছে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

ড. হিঙ্গোরানির পাশের বেডটাতেই ড. সুকুমার বসু শুয়ে আছেন। তিনিও কোমায় আছেন। মুখটা বিবর্ণ। কেউ যেন ব্লটিং পেপার দিয়ে সমস্ত রঙ শুষে নিয়েছে। চোখদুটো আঠা দিয়ে যেন আটকানো। অসম্ভব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল ড. বসুর। ভারি কাঁচের চশমার ফাঁক দিয়ে যখন তাকাতেন, তখন মনে হত একেবারে ভিতর অবধি দেখে নিচ্ছেন……

অথচ এই চোখদুটো হয়তো আর কখনও খুলবে না।

আর তার পাশেই ড. হিঙ্গোরানি…

অমন দাপুটে মানুষটাকে এত অসহায় আগে আর কখনও মনে হয়নি। কী শীতল নিরাপত্তাহীনতায় পড়ে আছেন বিছানায়। মুখে মৃত্যুর পাণ্ডুর ছায়া!

কেন জানি না...যদিও আমি...খুব শক্ত...খুব শক্ত মানুষ...আমি আমার বাবার মৃত্যুতেও কাঁদিনি...কিছুতেই আমার চোখে জল আসে না.....।

কিন্তু আজ কেঁদে ফেললাম! ড. হিঙ্গোরানির দিকে তাকিয়ে চোখ জলে ভরে এলো। আর নিজেকে সামলাতে পারি না। কোনমতে আইসিইউ থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এসেছি।

গৌতম বাইরেই দাঁড়িয়েছিল। আমার অবস্থা দেখে সে ভুলে গেল যে আমি ওর স্যার। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরেছে আমাকে।

–স্যার...

ওইটুকু বলারই অপেক্ষা ছিল। ওর বুকে মাথা রেখে ছোট শিশুর মতো হাউ হাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। ওর চোখেও জল। ড. হিঙ্গোরানিকে ভালোবাসে না, এমন লোক বোধহয় নেই। ভীষণ মেজাজী লোক ঠিকই, কিন্তু দয়ামায়া কাকে বলে তা বোধহয় ওঁর কাছ থেকেই শিখতে হয়। কী ছিলাম আমি? কতটুকু ছিলাম? বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন

ছিল চোখে। কিন্তু সংস্থান ছিল না। বাবার সামান্য রোজগারে স্বপ্ন সফল হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল না। সেইসময় ড. হিঙ্গোরানিই আমার হাত ধরেছিলেন। ঈশ্বর সকলের জীবনেই একজন না একজন দেবদূত পাঠান।

আমার সেই দেবদূত এখন আইসিইউতে গভীর কোমায় আচ্ছন্ন হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে!

অথচ আমার কিছু করার নেই! কী অসহায় আমি!

গৌতম বিড়বিড় করে যেন আপনমনেই বলে– ফুলের বোকেটার জন্যই এ সর্বনাশ!

আমি ওর কথাটা ঠিক ধরতে পারি না। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে সে আবার বলল–আপনি চলে যাওয়ার প্রায় তিনঘন্টা পরে একটা ফুলের বোকে। এসেছিল স্যার।

আমার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। বুঝতে অসুবিধে হল না যে গৌতমের সন্দিগ্ধ ইঙ্গিত কোনদিকে।

–ক্যামোফ্লেজিয়া?

ও আমার দিকে তাকিয়ে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে।

–আপনি বুঝতে পারছেন না স্যার? ফিসফিস করে বলল গৌতম–পরপর ইনসিডেন্টগুলো দেখুন। সবকটা সিম্পটম দেখুন। যখন আমি ড, হিঙ্গোরানির চিৎকার শুনে ছুটে যাই তখন ওনার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। এবং সবচেয়ে বড় কথা যে উনি কনফিউজড হয়ে গিয়েছিলেন। নার্সিংহোম শব্দটাও ঠিক মতো বলতে পারছিলেন না। একবার জল খেতে চাইছিলেন, কিন্তু যখন জল দিতে গেলাম তখন জলের দিকে এমন করে তাকালেন যেন জিনিসটা কী বুঝতে পারছেন না। এখানে আসার পর ডক্টর বললেন– মেজর কেস অব অ্যাসিস্টল। কোনও কার্ডিয়াক ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যাকটিভিটি ছিল না তখন।

ও চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। বলাই বাহুল্য যে এই হার্ট অ্যাটাক, সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া, ভেকিলার অ্যারিদমিয়া, কনফিউশন এবং অ্যাসিস্টল– এগুলো সব অ্যাকোনিটামের লক্ষণ! ক্যামোফ্লেজিয়াই যে সব কিছুর মূলে তা বুঝতে আর বাকি রইল না!

–বোকেটা কে পাঠিয়েছিল জানো?

–নাঃ। সে বলে–বোকেটার উপর কোনও নাম ছিল কি না মনে নেই। একগুচ্ছ নানা রঙের ফুলের বোকে ছিল শুধু এইটুকু মনে আছে। আর

যখন ড. হিঙ্গোরানি পড়ে গিয়ে ছটফট করছিলেন তখন তার পাশেই পড়েছিল বোকেটা।

–ফাইন। আমি তড়াক করে উঠে দাঁড়াই–চলো গৌতম।

–কোথায়?

–অফিসে। অজান্তেই নিজের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে–বোকেটা কে পাঠিয়েছে দেখা দরকার। লেটস গো।

গৌতম প্রথমে একটু কিন্তু কিন্তু করলেও পরে রাজি হয়ে গেল। ওর গাড়িতেই ফের আমরা ফিরে গেলাম ল্যাবে। ল্যাবরেটরির একটা চাবি সবসময় আমার সাথেই থাকে। সুতরাং ভেতরে ঢুকতে কোনও অসুবিধে হয়নি।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! পুরো ল্যাবরেটরি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেলো না বোকেটা! সেটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে! যে ঘরে ডক্টর পড়েছিলেন সে ঘর থেকে শুরু করে ডাস্টবিন পর্যন্ত আমরা সব খুঁজে–ঘেঁটে দেখলাম। কিন্তু ফুলের তোড়াটা অধরাই থেকে গেল!

অনেকক্ষণ খোঁজার পর যখন আমরা হতক্লান্ত হয়ে রণেভঙ্গ দিলাম ততক্ষণে প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। গৌতম রীতিমতো হাঁপাচ্ছে। কোনমতে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল–

–কেউ সরিয়ে নিয়েছে। আমি শিওর বোকেটা এখানেই পড়েছিল...কিন্তু কেউ...

–কে?

সে খানিকক্ষন চুপ করে থাকে। কী যেন ভাবছে। একটু সময় নিয়ে আবার বলল–

–একটা কথা মনে হচ্ছিল স্যার।

আমি ল্যাবরেটরির টেবিলে রাখা বোতল থেকে জল খেতে খেতে জানতে চাই– কী?

–ড. টোডি, ড. বসু ও ড. হিঙ্গোরানির মত লোক এতবড় একটা কাঁচা কাজ করলেন কী করে?

–মানে?

–মানে কোনও অ্যান্টিডোটের বন্দোবস্ত করেই ক্যামোফ্লেজিয়ার মতো বিষধর জিনিস আবিষ্কার করবেন, এত বড় মূর্খ কি তাঁরা ছিলেন?

আমি গৌতমের দিকে অপলকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকি। এই কথাটা এতক্ষণ আমার মাথায় আসেনি কেন?

কিন্তু অ্যান্টিডোট যদি থাকে তবে সেটা তারা নিজেরা ব্যবহার করেননি। কেন?

গৌতমকে কথাটা বলতেই ওর উত্তর– হয়তো সুযোগ পাননি। বোঝার আগেই বিষ কাজ করতে শুরু করেছে।

–হতে পারে। আমি উত্তেজিত–তাহলে সেক্ষেত্রে তার অ্যান্টিডোট এখানেই থাকবে। হয় অ্যান্টিডোট, কিম্বা তার ফর্মুলা। যতদূর জানি অ্যাকোনিটামের অ্যান্টিডোট হিসাবে নাক্স ভম কিম্বা ক্যাম্ফর ইউজ হয়। একবার গোটা ফমূলাটা পেয়ে গেলে বানিয়ে নিতেও অসুবিধে হবে না।...চিয়ার আপ... খোঁজো গৌতম...খোঁজো...।

শুরু হল খোঁজাখুঁজি। গৌতম আর আমি দুজনেই বুঝতে পারছিলাম যে ক্যামোফ্লেজিয়ার প্রকোপ এরপর আমাদের উপরই পড়বে। আমাদের অবস্থাও ড. টোডি, ড. বসু বা ড. হিঙ্গোরানির মত হবে। তাই অ্যান্টিডোট বা তার ফর্মুলাটা পাওয়া আমাদের কাছে জীবন-মরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুজনেই মরিয়া হয়ে খুঁজছি! যে কোন মূল্যেই হোক জিনিসটা পেতেই হবে। নয়তো আমাদেরও শেষ করে ছাড়বে ঐ ছদ্মবেশী ঘাতক!

ড. হিঙ্গোরানির প্রাইভেট ল্যাব আজ খোলা ছিল। উনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় এই দরজা বন্ধ হয়নি। আর কেউ পাসওয়ার্ড জানতো না।

মনে হল, হয়তো ডক্টর অ্যান্টিডোটটাও ঐ ঘরেই রেখেছেন।

–গৌতম, তুমি বাইরেটা খোঁজো। আমি প্রাইভেট ল্যাবের দিকে পা বাড়াই–আমি ভিতরটা দেখছি।

ল্যাবের ভিতরে সারি সারি শিশিতে নানারকম কেমিক্যাল। কোনটা সবুজ, আবার কোনটা বা গোলাপী। ছোট ছোট কাঁচের শিশিতে নানারকম তরল। এত শিশি আর বোতলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হচ্ছিল। এর কোনটায় আমাদের ইঙ্গিত বস্তু লুকিয়ে আছে? অ্যান্টিডোট ছাড়া ফুলটা তৈরি হল কী করে? যখন এটা তৈরি হচ্ছিল তখন থেকেই নিশ্চয়ই বিজ্ঞানীরা গ্যাস মাস্ক পরে ছিলেন না। ক্যামোফ্লেজিয়ার গন্ধ কখনও না কখনও তাদের নাকে গিয়েই থাকবে। মনে আছে ড. হিঙ্গোরানি বলেছিলেন–গন্ধটা মিষ্টি। যদি গন্ধ তাদের নাকেই না যায় তবে বুঝলেন কি করে যে গন্ধটা মিষ্টি!

দৃঢ় বিশ্বাস হল–তার মানে অ্যান্টিডোট আছে। গবেষণা চলাকালীন বিজ্ঞানীরা ফুলের গন্ধ ও পেয়েছিলেন। কিন্তু তখন তাদের কিছু হয়নি। অ্যাকোনাইট কাজ করতে বেশি সময় নেয় না। একঘন্টা দু ঘন্টার মধ্যেই কাম তামাম করে ফেলে।

সুতরাং তখন তারা নিশ্চয়ই অ্যান্টিডোট নিয়েছিলেন। ওটা এখানেই কোথাও আছে।

কিন্তু কোথায়?

ল্যাবের ভিতরে একটা মস্তবড় ফ্রিজার। মাইনাস সিক্স ডিগ্রিতে সেট করা আছে। এটাকে মাইনাস ফরটি ডিগ্রি অবধি সেট করা যায়। গ্লাভস পরে ফ্রিজারের দরজা খুলতেই হাড় হিম করা ধোঁয়া বেরিয়ে এলো। সেই ধোঁয়ার। ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে আরও কিছু ছোট ছোট শিশি। গায়ে লেবেল সাঁটা।

সামনের ব্লকে বড় বড় করে লেখা–অ্যান্টিডোটস।

এগুলোই অ্যান্টিডোট! নানান বিষ নিয়ে কাজ করেন ডক্টর। তাই প্রত্যেকটা বিষের ওষুধও তৈরি করা থাকে। সারসার শিশির মধ্যে আর্সেনিক অ্যান্টিডোট, থ্যালিয়াম অ্যান্টিডোট, সায়ানাইড অ্যান্টিডোট, নিউরোটক্সিন এলডি ফিফটির অ্যান্টিডোট–সবই চোখে পড়ল।

কিন্তু ক্যামোফ্লেজিয়া নেই!

আশ্চর্য ব্যাপার! ক্যামোফ্লেজিয়ার অ্যান্টিডোট এখানে নেই কেন? তবে কি অন্যকোথাও...?

প্রথমে সবকটা শিশি নামিয়ে নামিয়ে দেখলাম।... নেই! ল্যাবরেটরি প্রায় তছনছ করে খুঁজছি...।...নেই!.....কাগজপত্র, ফাইল ঘেঁটে দরকারি-অদরকারি কাগজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে একসা করলাম। আমারই তৈরি করা প্রোজেক্ট রিপোর্ট, ডিফেন্স মিনিস্ট্রির চিঠি, ক্যামোফ্লেজিয়ার ইনশিওরেন্স পেপার–সব বেরোলো...

কিন্তু ফর্মুলা?

...নেই!

হতক্লান্ত হয়ে মেঝের উপরই বসে পড়েছি। আবার ভীষণ কান্না পেয়ে গেল। ড. হিঙ্গোরানির জন্য নয়। নিজের কথা ভেবে! শেষ পর্যন্ত আমাকেও বিষ নিশ্বাস নিয়ে অসহায় গিনিপিগের মতো মরতে হবে! চোখের সামনে দেখলাম–ক্যামোফ্লেজিয়া আমার পিছনে ধাওয়া করছে। নীল বিষাক্ত শরীরে আমি.....

...নাঃ। এভাবে, এত সহজে মরবো? আমিও বিজ্ঞানী। এই কাগজপত্রের মধ্যে আর কিছু না হোক–কোথাও না কোথাও ক্যামোফ্লেজিয়ার ডি এন এ কোড রয়েছে। যদি একবারও সেটা পাই, তবে নিজেই তার অ্যান্টিডোট তৈরি করতে পারি। শুধু একবার ঠাণ্ডা মাথায় আমায় কাগজটা দেখতে হবে।

ফাইলের মধ্যে সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে বেরিয়ে এলাম প্রাইভেট ল্যাব থেকে। গৌতম ততক্ষণে সমস্ত ডিভিডি, সিডি চালিয়ে দেখে নিয়েছে।

কম্পিউটার তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে। ড. টোডি, ড, বসু আর ড. হিঙ্গোরানির নিজস্ব কম্পিউটার তাদের কেবিনেই থাকে। সবকটা দেখেছে, এমনকি আমার কম্পিউটারও ছাড়েনি। যদি কোন সিডি তে বা কম্পিউটারে ক্যামোফ্লেজিয়ার প্রেজেন্টেশন থাকে। কিম্বা তার অ্যান্টিডোটের প্রেজেন্টেশন। আজকাল বিজ্ঞানীরা কম্পিউটারেই তাদের রেকর্ড বেশি রাখেন। তাই সে তাও দেখতে বাকি রাখেনি।

কিন্তু ড. হিঙ্গোরানিকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। তিনি কম্পিউটারে কিছু রাখার লোক নন।

দেখা গেল আমার চেনাটাই সঠিক। গৌতম সব কম্পিউটার ঘেঁটেও কিছু পায়নি। হয় সেগুলো কেউ সরিয়ে দিয়েছে। নয়তো ডক্টররা কম্পিউটারে জিনিসটা রাখেননি।

–এখন কী করবো স্যার?

তার কণ্ঠস্বরে হতাশা–কিছুই তো পেলাম না।

–পাওয়া যাবে গৌতম, নিশ্চয়ই পাবো আমরা। ওকে সান্ত্বনা দিই– আমি বাড়িতে বসে ঠাণ্ডা মাথায় এই কাগজপত্র দেখবো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর মধ্যেই কিছু আছে। যদি ক্যামোফ্লেজিয়ার ডিএনএ কোডও পেয়ে যাই

তবে তা থেকে অ্যান্টিডোট বানিয়ে নিতে পারি। শুধু এইমুহূর্তে মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার।

সে ক্লান্তভাবে মাথা নাড়ে।

–এখন তুমি বাড়ি যাও। আমি আস্তে আস্তে বললাম–সকাল দশটার আগে তো ভিসিট করতে দেবে না। আমিও আসবো।

গৌতম সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল– চলুন স্যার, আপনাকে বাড়িতে ড্রপ করে দিই।

–চলো।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সকাল সাতটা বাজল। সারারাত জেগে, খোঁজাখুঁজি করে দুজনেই ভীষন অবসন্ন হয়ে পড়েছি। বিশাম দরকার।

আসার পথে আমাদের দুজনের কোনও কথা হয়নি। কোনও এক ভয় আমাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। আমি অন্যমনস্কভাবে ফাইলের কাগজ উল্টেপাল্টে দেখছিলাম। গৌতম ড্রাইভ করছিল। কোন কথা বলেনি। আমাদের অমোঘ আশঙ্কা একটা ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

আমাকে ড্রপ করার সময়ে গৌতমই প্রথম মুখ খুলল–আমার মনে হয় স্যার, কেউ সব রেকর্ড মুছে দিয়েছে। আমাদের মধ্যেই কেউ...আর বোধহয় বাঁচার উপায় নেই।

দেখলাম ওর উদ্ভ্রান্ত চোখে জল চিকচিক করছে।

আমারও মনে এই সন্দেহটা ঘুরছিল। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবেই সরিয়ে ফেলেছে। অ্যান্টিডোট। হয়তো কাগজপত্রও গায়েব করে দিয়েছে!

বুঝতে পারছিলাম না ওকে কি বলব। কিছু বলার আগেই সে আবার বলল–

–আসছি স্যার, সাবধানে থাকবেন।

গৌতম চলে গেল। আমি নিজের বাড়ির দিকে পা বাড়াই। একটু বিশাম দরকার। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে। একটু ঘুম.....

কিন্তু ...এ কি!

বাগানের পাশ দিয়ে যেতে যেতেই চমকে উঠলাম! কাল প্রতাপকে বলেছিলাম ঘাসফুলগুলো হেঁটে ফেলতে! ওকে কাটারি দিয়ে ঘাসফুল ছাঁটতেও দেখেছি,

তবে ওগুলো কি!...

বাগান আলো করে ঘাসের মধ্যে ছোট ছোট সাদা ফুল শিশির মেখে ঝলমল করছে! কাল সংখ্যায় কম ছিল। কিন্তু আজ প্রায় গোটা বাগান জুড়েই...!

মনে হল ফুলগুলো বোধহয় আমার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে! এত তাড়াতাড়ি এত ঘাসফুল কোথা দিয়ে এলো! সংখ্যায় প্রচুর! আর সারা বাগানই প্রায় ছেয়ে ফেলেছে! এগুলো কালও ছিল না...।

ঘাসফুল নয়...এ ঘাসফুল হতেই পারে না!

মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিলাম। পুরো বাগানের ঘাসই উপড়ে ফেলবো। ঘাস কাটার মেশিনটা আছে স্টোররুমে। ওটা দিয়েই নিকেশ করবো রক্তবীজের বংশধরদের। ঘাসও থাকবে না...ঘাসফুলও নয়!

আজ আর প্রতাপকে ডাকলাম না। এ কাজ নিজের হাতেই করা ফেলা ভালো। ওকেও বিশ্বাস করতে পারছি না। আমিই দেখে নেবো...!

গ্রাস কাটার চলতে শুরু করল।

চোখের সামনে দেখলাম ঘাসের গোড়া থেকে উপড়ে যাচ্ছে। সাদা ছোট ছোট ফুলগুলো নেতিয়ে পড়ছে ছিন্নমূল হয়ে। নাক আগেই ঢেকে নিয়েছিলাম। তাই গন্ধ পাওয়ার সম্ভাবনাই ছিল না। ঘাস কাটতে কাটতেই একটা পৈশাচিক আনন্দ টের পাই। যেন আমার মাথায় দানব ভর করেছে। সব কেটে ফেলব...সব শেষ করব...সবকটাকে যমের দোরে পাঠাবো।

দেখতে দেখতে গোটা বাগান সাফ হয়ে গেল। ঘাসগুলো বিধ্বস্ত হয়ে উপড়ে পড়ে আছে! তার সাথে ঘাসফুলও!

হিংস্র আনন্দে তাকিয়ে দেখলাম আমার বাগান ন্যাড়া হয়ে গেছে! বিবর্ণ হয়ে গেছে।প্রতাপ ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে এসে দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠেছে! বাগানে কোনও ঘাস নেই! সে পাগলের মতো ছুটে আসে। প্রায় হাহাকার করে ওঠে–

–স্যার...একি করছেন?

আমি রক্তচোখে ওর দিকে তাকাই। নিধুম এক রাত কাটিয়ে, দুশ্চিন্তায় চেহারাটা উন্মাদের মতো লাগছিল। লাল চোখ, উস্কোখুস্কো চুল, মুখে না। কামানো দাড়ি! ও বোধহয় এই রূপ দেখে ঘাবড়ে গেল। কিছু বলতে গিয়েও থেমে যায়।

আশেপাশে তাকিয়ে দেখি, ছোট ছোট ফুলের ঝাড় জ্বল জ্বল করছে। এত ছোট ছোট নানা রঙের ফুল কবে এলো আমার বাগানে! একেবারে গাছ আলো করে থোকায় থোকায় ফুটে আছে।

মনের ভিতরের সন্দেহ আর আশঙ্কা একসাথে দানবের মতো দাপাতে শুরু করে।

ওগুলো কী? কী?...কী?

বলা যায় না...কিছু বলা যায় না...ও ফুল যেকোন জায়গায়, যে কোন রঙে ছদ্মবেশে ফুটে থাকতে পারে।

নাঃ, ফুল চাই না আমি...এ বাগানে কোন ফুল থাকবে না...কোন ফুল...কোন গাছ নয়! বরং বাগানটাই দরকার নেই! বাগানটাই থাকবে ...ওড়াও...সব উড়িয়ে দাও...কিছু দরকার নেই!...নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি কিছু না...কোন সৌন্দর্য, কোন সৌরভ–কিছু না!

ধ্বংস হোক...ধ্বংস হোক সব...

প্রতাপকে দিয়ে কাজটা করালাম না। বলা যায় না, হয়তো মায়ায় পড়ে একটা দুটো গাছ রেখে দেবে। তাই নিজের হাতেই এক এক করে সব ধ্বংস করলাম। আমার বাগান নিমেষের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হিরোশিমা-

নাগাসাকির মতো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। যে গাছগুলোকে নিজুেই এনেছিলাম, সাজিয়ে তুলেছিলাম বাগান, সেই গাছগুলোকে নির্মম হাতে তুলে ফেলে দিলাম!

ফুল বড় ভালবাসতাম আমি...

আজ সবচেয়ে বেশি ভয় পাই এই ফুলকেই...ঘেন্না করি...ঘেন্না করি...

৫.

বিকেলের দিকে ভিজিটিং আওয়ারে আরেকবার দেখে এলাম দুই বৈজ্ঞানিককে।

অবস্থার উন্নতি কিছুই হয়নি। বরং ইনটেনসিভ কেয়ারে ডাক্তারদের ব্যস্ততা দেখে মনে হল আজ বোধহয় দুজনেরই অবস্থা খারাপ।

আমরা আজ আর ভিতরে ঢোকার অনুমতি পেলাম না। বাইরে দাঁড়িয়েই জানলার কাঁচ দিয়ে দেখলাম মৃত্যুশয্যায় শায়িত দুই বৈজ্ঞানিক কে।

ড. হিঙ্গোরানির ছেলে বিদেশে থাকে। খবর পেয়েছে, কিন্তু এসে পৌঁছতে পারেনি। ড. বসুর স্ত্রী আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। কতরাত ঘুমোননি

কে জানে। চোখের তলায় কালি পড়েছে। তার দিকে তাকাতেও পারছিলাম না! কথা বলার সাহসও হল না।

ডিফেন্স মিনিস্ট্রির একজন হোমরা চোমরা এসেছিলেন আজ। গম্ভীর মুখ করে বাইরে থেকেই ব্যাপারটা দেখে গেলেন। তার মুখে একটা নিরাশার ছাপ লক্ষ করছিলাম। সেটা আবিষ্কারটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার জন্য না দুই বিজ্ঞানীর অবস্থা দেখে, কে জানে!

গোটা ভিজিটিং আওয়ারটাই বাইরে দাঁড়িয়ে কেটে গেল। বিকেলবেলা ফিরে এলাম বাড়িতে। বাগানের জায়গায় এখন মরুভূমির মত নিষ্ফলা একটুকরো জমি খাঁ খাঁ করছে। অন্য সময় হলে বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠল। কিন্তু আজ আমি নিষ্ঠুর! ভীষণ নিষ্ঠুর!

স্নায়ুর উপর দিয়ে ভীষণ চাপ যাচ্ছিল। এক পেগ হুইস্কি তৈরি করতে করতেই অনুভব করলাম...

গোলাপের গন্ধ! সারা ঘরে হাল্কা গোলাপের গন্ধ ছড়িয়ে আছে!...

কিছুক্ষণের জন্য যেন হৃৎপিণ্ডটা স্তব্ধ হয়ে গেল...। গোলাপের গন্ধ কোথা দিয়ে আসছে? বাগানের ত্রিসীমানায় আগেই কোনও গোলাপ ছিল না। এখন তো বাগানটাই নেই! তবে গোলাপ কোথা দিয়ে এলো?

হঠাৎই বুঝতে পারলাম শরীরটা খারাপ লাগছে। হার্টবিট বেড়ে গেছে! আমার গোলাপের গন্ধে অ্যালার্জি।

আমার ড্রয়ারে সবসময়ই নেস্ট্রোমিফিন রাখা থাকে। অ্যালার্জির ওষুধ। ফয়েল থেকে বের করে একটা খেয়ে নিলাম। গোলাপের গন্ধটা তাড়ানো দরকার। কোথা থেকে আসছে কে জানে। জানলা দরজা বন্ধ করে রুমফ্রেশনার ছড়িয়ে দিই চতুর্দিকে। মদন আজ সকালেই এই নতুন রুম ফ্রেশনারটা দোকান থেকে নিয়ে এসেছে বোধহয়।

সবকাজ শেষ করে নিশ্চিন্ত হয়ে ফের কাজে লেগে যাই। ল্যাব থেকে আনা কাগজ গুলো খুব মন দিয়ে পড়তে শুরু করেছি। অদরকারি কাগজপত্রই বেশি। ক্যামোফ্লেজিয়ার কয়েক কোটি টাকার ইনশিওরেন্স আছে। তার কাগজপত্র, ডিফেন্সের চিঠি, কিছু কেমিক্যাল কেনার রশিদের কপি, অ্যাকোনিটাম কেনার রশিদ……

দেখতে দেখতেই চোখে পড়ল একটা কাগজে কি যেন হিজিবিজি লেখা…

কোনও সন্দেহ নেই যে এটা ডক্টর হিঙ্গোরানির হাতের লেখা। তার মতো দুর্বোধ্য হিবুর মতো হাতের লেখা আর কারুর নেই।

কিন্তু এসব কি হিজিবিজি এঁকেছেন! দেখে মনে হচ্ছে একটা প্ল্যানিং। ডি এন এ কোডের প্ল্যানিং?

উত্তেজনায় শরীর টানটান হয়ে উঠল। এই তবে ক্যামোফ্লেজিয়ার ডি এন এ কোডের ছবি। এত খোঁজাখুঁজির পর শেষপর্যন্ত পাওয়া গেল!

কিন্তু একি! এর মধ্যে অ্যাকোনিটামের ডিএনএ তো দেখছি না। বরং কিছু সাপের বিষের সাইকেন দেখা যাচ্ছে! ক্যামোফ্লেজিয়া সাপের বিষে তৈরি! ডক্টর হিঙ্গোরানি কি তবে ভুল বলেছিলেন? বা চেপে গিয়েছিলেন আমাদের কাছে আসল সত্যিটা?

আমি ভালো করে কাগজটা দেখতে চাইছিলাম। কিন্তু ক্রমশই শরীরটা কেমন যেন অবসন্ন হয়ে আসছে। গোলাপের গন্ধটা আরও তীব। ভীষন অসুস্থ মনে হচ্ছে নিজেকে। চোখে ঝাপ্সা দেখছি, বুক ধড়ফড় করছে...

সব দরজা জানলা বন্ধ! তবে গোলাপের গন্ধ আসছে কোথা দিয়ে!মদন কি ঘরে কোথাও গোলাপ এনে রেখেছে নাকি? আমি হুইস্কির গ্লাসে কয়েকটা উত্তেজিত চুমুক লাগাই, তারপর ফয়েল থেকে আরও কয়েকটা নেস্ট্রোমিফিন বের করে টপাটপ খেয়ে ফেলি। অ্যালার্জিটা ক্রমশই বাড়ছে। দেখতে হবে গোলাপ কোথায় রাখা আছে।

অদ্ভুত ব্যাপার–সমস্ত ঘর খুঁজেও কোথাও গোলাপের একটা পাপড়ি তো দূরের কথা, একটা কাঁটাও নজরে এল না! কোথাও গোলাপ নেই এ বাড়িতে। তবে?

আবার একটা আশঙ্কা মনের মধ্যে চেপে বসল! ক্যামোফ্লেজিয়ার গন্ধ কি তবে গোলাপের মত! ক্রমশই মনে হচ্ছে বুকের উপর কিসের যেন একটা ভয়ানক চাপ। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে...। চোখের সামনে সব ঝাপ্সা হয়ে আসছে।

আমি জোরে জোরে শ্বাস নিতে শুরু করি...। কিন্তু পারছি না! দেহ অবশ হয়ে আসছে। প্রচন্ড বমি পাচ্ছে, দরদর করে ঘামছি।

বুঝতে পারছি এ যাত্রা বোধহয় আর বাঁচবো না! নার্ভগুলো কাজ করা ছেড়ে দিয়েছে, বুকে ভীষণ কষ্ট! এ ক্যামোফ্লেজিয়ার সিম্পটম! নির্ঘাৎ ক্যামোফ্লেজিয়া...! কিন্তু কোথায়? আমার বাগানে আর কোনও ফুল নেই। আশেপাশে কোনও ফুল চোখে পড়ে নি। ভেবেছিলাম ক্যামোফ্লেজিয়াকে আমি অনেক দূরে ফেলে আসতে পেরেছি.....

আঃ...অক্সিজেন...একটু অক্সিজেন...আমি ধড়ফড় করছিলাম একটু অক্সিজেনের জন্য...চোখে আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে আসছে...মৃত্যুযন্ত্রণা কাকে বলে বুঝতে পারছি...বুঝতে পারছি ক্যামোফ্লেজিয়া আমার খুব কাছেই আছে.....

জ্ঞান হারাবার আগে শুনতে পেলাম আমার মোবাইল ফোন বাজছে। বাজছে। আমার খুব প্রিয় রিংটোন...কারেন কার্পেন্টারের গলা–

–জাস্ট লাইক মি...দে ওয়ান্ট টু বি...ক্লোজ টু ইউ.....

তারপরই সব অন্ধকার!

৬.

মনে হচ্ছিল কোথাও একটা ভেসে বেড়াচ্ছি!

না এই জবরজং শরীরটা নিয়ে নয়। বরং বেশ সূক্ষ্ম একটা অস্তিত্ব টের পাচ্ছিলাম। এত হাল্কা নিজেকে কখনও মনে হয়নি। এত মুক্ত ও নয়। অনাবিল অন্ধকারের মধ্যে যেন সাঁতরে বেড়াচ্ছি!

সাঁতরাতে সাঁতরাতেই টের পেলাম যে শরীরটা হঠাৎ করে বড় ভারি হয়ে যাচ্ছে। আঃ...অন্ধকারের মধ্যে কে আলো জ্বেলে দিল দুম করে? শান্ত নিস্তব্ধতা ভেঙে নানারকম আওয়াজ কানে আসছে।

দপ করে যেন চোখের সামনে লক্ষ হ্যালোজেন জ্বলে উঠল। জন্মযন্ত্রণা যেন দ্বিতীয় বার অনুভব করলাম। মনে হচ্ছিল আমি কোন গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসছি–চতুর্দিকে অনেক আওয়াজ, অনেক আলো আমায় কষ্ট দিচ্ছে। অনুভূতিগুলো যেন একটা অদ্ভুত পীড়নের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল।

কোনমতে চোখ মেলে তাকাই...কে আমায় এমনভাবে বিরক্ত করছে? কেনই বা করছে? দিব্যি তো ছিলাম একা একা! কে...?

আলোর তীব্রতায় কিছুক্ষণের জন্য চোখ বুজে ফেলেছিলাম। আবার তাকানোর চেষ্টা করি...এত আলো!...আমি কোথায়?...

–অ-নু-প-ম!

কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে! আমার মুখের সামনে দুটো ঝুঁকে পড়া উদ্বিগ্ন মুখ!

....কে?... চিনতে পারলাম না...সব ঝান্সা...! শরীরটাকে ভীষন ভারি মনে হচ্ছিল। কোনমতে উত্তর দিই–।

–থ্যাঙ্ক গড! জ্ঞান ফিরেছে! কে যেন সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে–ওঃ ঈশ্বর...হি ইজ ওকে...হি ইজ গেইনিং সেন্স... উঁ।

ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। আস্তে আস্তে ঘুমটা যেন আমায় চেপে ধরল।

আবার অন্ধকার!

কতক্ষণ মড়ার মত ঘুমিয়েছি জানি না। অনেকক্ষন একটানা ঘুমোনোর পর আস্তে আস্তে হুঁশ ফিরে পেলাম। এবার বুঝতে পারি নার্সিংহোমে আছি। এটা আই সি ইউ। আমার নাক থেকে বোধহয় সদ্যই অক্সিজেন মাস্ক খোলা হয়েছে।

–অনুপম, কেমন লাগছে এখন?

পরিচিত গলার স্বর শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে পাশে তাকাই। যা দেখি তাতেই চক্ষু চড়কগাছ! আমাকে রাখা হয়েছে ড. হিঙ্গোরানি ও ড, বসুর নার্সিংহোমেই। ইনফ্যাক্ট তাদের পাশেই!

বিস্ময়ের কথা এটা নয়। যা দেখে চমকে উঠলাম, তা হল–……

উপরোক্ত দুজনই আমার বিছানার পাশে বসে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে!

বিস্ময়ের পরই অদ্ভুত আনন্দে মন ভরে গেল। পারেনি…ক্যামোফ্লেজিয়া এই দুজনকে নিয়ে যেতে পারেনি…ক্যামোফ্লেজিয়া হেরে গেছে…হেরে গেছে…সৃষ্টি স্রষ্টাকে ধ্বংস করতে পারেনি…

আমি প্রায় লাফ মেরে উঠে বসতেই যাচ্ছিলাম, তার আগেই ড. হিঙ্গোরানি আমায় ধরে ফেলেছেন। সস্নেহে টেনে নিলেন বুকে–ওয়েলকাম ব্যাক অনুপম!যা ভয় দেখিয়েছিলে!সাতদিন ধরে তোমার সেন্স ছিল না। এমন কাণ্ড একজন বিজ্ঞানী হয়ে করলে কি করে?

আমি বলতে গেলাম ক্যামোফ্লেজিয়া……

আমাকে, থামিয়ে দিয়েই ড. বসু বললেন–ক্যামোফ্লেজিয়া নয়। তোমার রোজ এসেন্সে অ্যালার্জি। তার সাথে প্রচুর নেস্ট্রোমিফিন খাওয়া, এবং

লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট সাথে অ্যালকোহল! তুমি একটা বিজ্ঞানী অনুপম! তোমার মনে ছিল না যে নেস্ট্রোমিফিন যতই নিরীহ অ্যালার্জির ওষুধ হোক না কেন, অ্যালকোহলের সাথে মিষলে মারাত্মক বিষ হয়ে দাঁড়ায়? কটা খেয়েছিলে ট্যাবলেট?

মনে করার চেষ্টা করি– চার পাঁচটা হবেই...।

ড. হিঙ্গোরানি শাসনের ভঙ্গিতে বলেন–তোমার লজ্জা করে না? উপরে যাওয়ার বন্দোবস্ত তো প্রায় পাকাই করে ফেলেছিলে। তোমার কাজের লোক মদন ঠিক সময়ে উদ্ধার না করলে কোথায় থাকতে তুমি?

এরপর তাঁদের মুখ থেকেই শুনি মদন আমায় ঐ অবস্থায় দেখে সঙ্গে সঙ্গে ল্যান্ডফোন থেকে ফোন করে গৌতমকে। মদন মোটামুটি এসব কাজ করতে পারে। প্রতাপও পারে। গৌতমের কথা মত ওরা দুজনেই আমাকে ঐ অবস্থায় এই নার্সিংহোমে নিয়ে আসে। এই সাতদিন রোজ দুবেলা গৌতম এসেছে। মদন আমায় দেখতে না পেলেও, আই সি ইউর সামনে থেকে একমুহূর্তও নড়েনি। আজ আমার হুঁশ ফিরেছে শুনে মন্দিরে ছুটেছে পুজো দিতে।

আবেগে চোখে জল এল। এরা সবাই আমায় কত ভালোবাসে! অথচ এ কদিন আমি শুধু স্বার্থপরের মত নিজের কথাই ভেবে গেছি...কি স্বার্থপর আমি...!

মনে একটা প্রশ্ন বারবার ফিরে আসছিল। থাকতে না পেরে প্রশ্নটা করেই ফেলি–

–ডক্টর?

–বলো।

–গোলাপের গন্ধটা কোথা থেকে এলো? আমার ঘরে কোথাও গোলাপ ছিল না। বাগান তো আমি নিজেই উড়িয়েছি। তবে...?

–সেটার উত্তরও মদন তোমার ডাক্তারকে দিয়েছে। ড. হিঙ্গোরানি হাসলেন–তুমি ওকে রুম ফ্রেশনার আনতে দিয়েছিলে। ও জানতো না যে তোমার রোজ এসেন্সে মারাত্মক অ্যালার্জি। বেচারা একটা রোজ এসেন্সের রুম ফ্রেশনার এনেছিল।

এইবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। ক্যামোফ্রেজিয়া নয়। আসল ভিলেন ঐ রুমফ্রেশনার। আমি ঘরে ঢোকার আগেই সম্ভবত মদন স্প্রে করে রেখেছিল। ঘরে ঢোকামাত্রই ঐ গন্ধটা পেয়েছি। গন্ধটা কাটাবার জন্য দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়ে বোকার মতো ঐ রুমফ্রেশনারটাই বারবার স্প্রে করেছিলাম। যার জন্য গোলাপের গন্ধ ক্রমশই বাড়ছিল!

আর তার সাথে বাড়ছিল আমার অ্যালার্জি।

–অ্যান্ড দেন ফাইভ নেস্ট্রোমিফিনস উইদ অ্যালকোহল। ড. হিঙ্গোরানি বললেন–আরেকটু হলেই চ্যাপ্টার ক্লোজড হচ্ছিল তোমার। বেঁচে যে আছ এই অনেক।

আমি আনন্দে গদগদ হয়ে বলি– স্যার, আপনাদের দেখে যে কি আনন্দ হল কি বলি...। আমাদের যে কি অবস্থা হয়েছিল.....।

–হ্যাঁ জানি। ড. বসু বললেন–তুমি তো একেবারে ভেউভেউ করে কাঁদছিলে।

ওঁর কথা শুনে চমকে উঠলাম! উনি জানলেন কি করে? দুজনেই তো কোমায় ছিলেন!

কথাটা বলতেই উত্তর এলো–ঘোড়ার ডিম ছিলাম! কিস হয়নি আমাদের। সেফ অসুস্থতার অ্যাকটিং করে কয়েকটা দিন ছুটিতে কাটাচ্ছিলাম।

আমি পুরো হাঁ! তবে? ক্যামোফ্লেজিয়া.....? যা ভাবছিলাম...তার সবটাই কি...!

–ক্যামোফ্লেজিয়া। হেসে ফেললেন ড. হিঙ্গোরানি–ক্যামোফ্লেজিয়ার ফমূলা শুনবে? বেশ, শোন তাহলে...।

এরপর ডক্টর যা বললেন তাতে আমার আরেকবার হার্টফেল করার মতো দশা হল...

ডক্টর হিঙ্গোরানি, ড. বসু ও ড. টোডি–তিনজনে মিলে গোপনে ক্যান্সারের উপর রিসার্চ করছিলেন। ক্যান্সারের ওষুধ বের করার চেষ্টা চলছিল। কাজ অনেকটাই গুটিয়ে এসেছে। অথচ এক্সপেরিমেন্ট এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মূলধন অপর্যাপ্ত। সরকারি সাহায্য চাইলেন। প্রত্যাখ্যাত হল তাদের আবেদন।

এদিকে কাজ এগোনোর জন্য টাকা চাই। কী করণীয়?

এই সময়ে ডক্টর টোডির মাথায় এক অদ্ভুত বুদ্ধি জোগাল। তিনি বললেন যে, সরকার জীবনদায়ী ওষুধের পিছনে টাকা খরচ করে না। কিন্তু মারণাস্ত্রের পেছনে করবে। তাই তিনজনে মিলে তৈরি করলেন এই সাইলেন্ট কিলারের পরিকল্পনা! নতুন আবিষ্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, সরকারের কাছ থেকে কিছু টাকা হাতানোর জন্য–যাতে তাদের গোপন আবিষ্কারের কাজ ঠিকঠাক চলতে পারে।

–তাহলে...আমরা যে দেখলাম...! ক্যামোফ্লেজিয়া এঁকে গিনিপিগগুলো মরল .....?

ড. বসুর সহাস্য উত্তর–ওগুলো রোগেভোগে কষ্ট পাচ্ছিল। তাই ভাবলাম মার্সিডেথ দিয়ে দিই। ত্রিশ মিলিগ্রাম অ্যাকোনাইট আগেই ওদের শরীরে পুশ করা ছিল। একদম সঠিক মাত্রায়, সঠিক টেম্পারেচারে। যাতে ঠিক একঘন্টা পরেই মারা যায়। আর ঠিক একঘন্টা পরেই তোমরা ডেমো দেখেছিলে।

আমি হাঁ। কী বলব বুঝতে পারছিলাম না।–তবে...তবে রঙ পাল্টানোর ব্যাপারটা...?

–ওটাও প্রযুক্তিবিদ্যার কারিকুরি ডিয়ার। ড. হিঙ্গোরানি হাসছেন–যে ডায়াসের উপরে আমি দাঁড়িয়েছিলাম তার ঠিক মাথার উপরই একটা ন্যানো প্রোজেক্টর ছিল। সেটা কন্ট্রোল করছিলেন ড. বসু। আমি সারফেসে যে রঙ রাখছিলাম উনি ঠিক সেইরকম আলোই প্রোজেক্টরের মাধ্যমে ফুলটার উপরে ফেলছিলেন। ওটার অরিজিনাল রঙ সাদা বলে মনে হচ্ছিল রঙ পালটে পালটে যাচ্ছে।

–আর ডক্টর টোডি?

ড. হিঙ্গোরানি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন–ওনার মৃত্যটা ওরিজিনাল। বড্ড ড্রিঙ্ক করছিলেন আজকাল। ওটা আমাদের প্ল্যানের মধ্যে ছিল না। কথা ছিল আমি কাঁচের মধ্যে যে ফুলটা ছিল সেটা একদম নষ্ট করে ফেলব, এবং মাথা ফাটিয়ে ক্যামোফ্লেজিয়া চুরি যাওয়ার নাটক করবো। আর সেটা

করতে হবে কয়েকদিনের মধ্যেই। কারণ কয়েকদিন পরেই ডিফেন্স ক্যামোফ্লেজিয়া নিয়ে যাবে। তার আগেই...

–তাহলে ওটাও নাটক!

–হ্যাঁ। ড. হিঙ্গোরানি বললেন–ভেবেছিলাম যে ডিফেন্স মিনিস্ট্রি হতাশ হয়ে এমন জিনিস দ্বিতীয়বার আর তৈরি করার কথা বলবে না। কিন্তু তারা আমাদের উপর চাপ দিতে লাগল দ্বিতীয়বার ক্যামোফ্লেজিয়া তৈরি করার জন্য। কি করে এড়ানো যায় তাই ভাবছিলাম। এর মধ্যেই ড. টোডি হার্টফেল করলেন। ওঁর হার্টের অবস্থা খারাপ ছিল। মৃতযুটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু ওঁর মৃতটাই আমাদের রাস্তা দেখিয়ে গেল। ঠিক তখনই দুজনে মিলে ঠিক করলাম এইরকম একটা নাটক করব। যাতে ডিফেন্স মিনিস্ট্রি হাড়ে হাড়ে টের পায় যে এইজাতীয় অস্ত্র কি মারাত্মক হতে পারে। তিনি হাসতে হাসতে বলেন–আশা করি এতদিন কোমায় থাকার পর ওরা আর আমাদের নতুন করে ফের জিনিসটা আবিষ্কার করতে বলবে না। যথেষ্টই ভয় পেয়েছে।

বিস্ময়ের প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছিলাম। ব্যাপারটা যত পরিষ্কার হচ্ছিল ততই নিজের গালে চড় মারার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠছিল।

তা সত্ত্বেও আমার মনে একটা কিন্তু ছিল।

–ডিফেন্স মিনিস্ট্রির টাকাটার কি হবে?

–কী আর হবে? ডক্টর সুন্দর হাসলেন–ক্যামোফ্লেজিয়ার একটা মোটা টাকার ইনশিওরেন্স ঐ কথা ভেবেই করিয়ে রাখা হয়েছে। সেই টাকা থেকেই ওদের টাকা ফেরৎ যাবে। বাকি টাকাটা লাগবে আমাদের ক্যান্সার রিসার্চ প্রোজেক্টে।

–তার মানে ক্যামোফ্লেজিয়া...?

–ঐ নামে কিছু কোনওদিন ছিল না, এখনও নেই, আগামীতেও হবে না। তিনি দুষ্টু বাচ্চার মতো হেসে উঠলেন–তোমরা যা দেখেছো সেটা নেহাৎই একটা ঘাসফুল। আর বাদবাকি সব মায়া! একথা আগে আমরা তিনজন আর পরে এই নার্সিংহোমের ডক্টর জানতেন।তিনিও চমৎকার অ্যাকটিং করেছেন। আর এখন জানলে তুমি...।

আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম! তাহলে এতদিন কিসের ভয় পেয়ে এসেছি.....!

হঠাৎ করে প্রতাপের মুখটা মনে পড়ল। বড় কষ্ট হল ওর জন্য। বাড়িতে ফিরে ওকে বোঝানোর চেষ্টা করবো নিশ্চয়ই...

কিন্তু ও কি বুঝবে.....?

ছায়া ভূত ভূত

–ডাক্তারবাবু.....আমি কি বেঁচে আছি?

প্রশ্নটা শুনে ডাক্তারবাবুর ভুরুতে সামান্য ভাঁজ পড়ল।

মাথার উপরে একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে। তাতে সামনের মানুষটাকে স্পষ্ট দেখতে না পেলেও তার অস্পষ্ট ছায়া ছায়া অবয়ব বোঝা যাচ্ছিল। নাকের উপর ভারি চশমার কাঁচ ঐ আধা আলো আধা অন্ধকারেই চকচক করে উঠছে। মুখের চাপদাড়ির জঙ্গল বুঝতেও অসুবিধা হচ্ছিল না।

মনস্তত্ত্ববিদের ঘর যেমন হয়, এ ঘরটাও তেমনই। আলোর চেয়ে অন্ধকারই বেশি। ডাক্তারবাবু টেবিলের ওপ্রান্তে বসে আছেন, আর রোগী এ প্রান্তে। কাউকেই বিশেষ স্পষ্ট দেখার উপায় নেই। শুধু দেওয়ালে দুটো ক্ষীণ ছায়া মাঝে মাঝে নড়েচড়ে উঠছে।

ডক্টর সিনহা প্রশ্নটায় বেশ কৌতুকবোধ করলেন। আস্ত একটা জলজ্যান্ত লোক জিজ্ঞাসা করছে যে সে বেঁচে আছে কিনা!

–এমন মনে হচ্ছে কেন আপনার?

লোকটা যেন একটু ইতস্তত করল। একটু উশখুশ করে উঠে বলল–একটা সিগ্রেট খেতে পারি?

এখানে ধূমপান মানা হলেও লোকটার অবস্থা দেখে ডাক্তারবাবুর দয়া হয়। অসম্ভব ভয়ে সে জড়োসড়ো! গলার স্বর কাঁপছে! একটু যেন ফাঁসাসেও!

–নিশ্চয়ই।

সে কাঁপা কাঁপা হাতে সিগ্রেট ধরাল। হাত দুটোও থরথর করে কাঁপছে। লাইটার জ্বালাতেই ডাক্তারবাবু তার চোখ দুটো একঝলক দেখতে পেলেন। লাল টকটকে চোখ। যেন রক্ত জমে আছে চোখে! একবারের জন্য যেন মনে হল– লোকটার চোখের মণিটা লাল!

মুহূর্তের জন্য হলেও চমকে উঠেছেন তিনি। পরক্ষণেই সামলে নিলেন। হয়তো বহুদিন লোকটা ঘুমোয়নি। সেই জন্যই চোখ অমন লাল।

কিন্তু চোখের মণি অমন লাল হয় কী করে?……

নাঃ, তিনি নিজেকে বোঝালেন। হয়তো লাইটারের সামান্য আলোয় তার চোখের ভুল হয়েছে। একটা স্বাভাবিক মানুষের চোখের মণি লাল কখনই হয় না।

একেই বলে ইলুশন!

লোকটা সিগ্রেটে উত্তেজিত কয়েকটা টান মেরে যেন একটু শান্ত হয়। বলে– ডাক্তারবাবু, আপনি একটু দেওয়ালের দিকে তাকাবেন প্লিজ?

এমন উদ্ভট আবদারে তিনি অবাক ও বিরক্ত দুই-ই হলেন। কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদের চটে যাওয়ার উপায় নেই।

–কেন?

সে ফিসফিস করে বলে–দেখুন তো দেওয়ালে কটা ছায়া দেখা যাচ্ছে?– আপনি নিজেই তো দেখে নিতে পারেন...!

— আমার ভয় করছে! অসম্ভব ভীত, সন্ত্রস্ত গলা তার– বলুন না। ক'টা দেখা যাচ্ছে?

তিনি আরও অবাক–সে কি! কটা আবার দেখা যাবে! দুজন আছি, তাই দুটোই দেখা যাচ্ছে!

–তিনটে নয় তো?

–তিনটে! তিনটে কেন থাকবে?

লোকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে–থ্যাঙ্কস। তাহলে তিনটে নেই……

এবার বোধহয় ডক্টর সিনহা ভদ্রলোকের বিষয়ে কৌতূহল বোধ করলেন। লোকটার হাবভাব যেন কেমন উদ্ভট! ত্রিশ বছরের কেরিয়ারে অনেক উদ্ভট রোগীর দেখা তিনি পেয়েছেন। কিন্তু এমন রোগী দেখেননি। ওকে একটু গুছিয়ে নেওয়ার সময় দিলেন তিনি। তারপর আলতো গলা খাকারি দিয়ে বলেন—

–কী হয়েছে আপনার? কী সমস্যা?

–বলবো… সে আস্তে আস্তে বলে–বলবো বলেই তো এসেছি। কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়!

–কোথায়?

লোকটা এবার অদ্ভুত ভাবে তাকায় তার দিকে। ডাক্তারবাবুর মনে হল লোকটার চোখ যেন হঠাৎ জ্বলে উঠল…

–আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন তো?

–কেন করবো না?

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে–তবে শুনুন...আমার নাম তপন মিশ্র। আমি রাইটার! থ্রিলার লিখি...

–তপন মিশ্র! ডক্টর সিনহা অবাক হয়ে বলেন–আপনি তপন মিশ্র। রাতের ভয়ঙ্কর গল্পটার লেখক?

–হ্যাঁ। আমিই...।

তপন মিশ্রের কথা।

প্রত্যেকবার এইসময়টাই আমার বড্ড চাপ যায়।

পূজাবার্ষিকীতে থ্রিলারের কদর খুব বেশি। বিশেষ করে কিশোর পত্রিকাগুলোতে। তাই প্রায় জানুয়ারি থেকেই আসতে থাকে সম্পাদকদের ফরমায়েশ! জানুয়ারি থেকে জুলাই অবধি দম ফেলার ফুরসতও থাকে না।

এবার এক সম্পাদক এলেন অদ্ভুত এক ফরমায়েশ নিয়ে। বললেন–দাদা, গোয়েন্দা গল্প নয়, এবার একটু অন্যরকম লেখা চাই আপনার।

কীরকম লেখা চান জানতে চাইলে বললেন–একদম টানটান থ্রিলার। একটা বিভৎস চরিত্রকে নিয়ে। ভিলেন চরিত্র। সাইকো আজকাল

বাজারে খুব খাচ্ছে! খুনের সিকোয়েন্স থাকবে অনেকগুলো। রক্তারক্তি কাণ্ড! দেখবেন–পুরো হটকেক হয়ে যাবে।

–যখন সব ফর্মুলাই জানেন, তখন নিজেই একটা হটকেক বানিয়ে ফেলুন!।

...না...এ কথাটা বলিনি! ভাবছিলাম বলবো কিনা। কিন্তু চেপে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ মনে হল। মুখে শুধু বললাম–বেশ।

বলে তো দিলাম–কিন্তু এমন চরিত্র আমদানি করি কোথা থেকে! প্রচুর থ্রিলার পড়তে শুরু করলাম। ইংরাজি, বাংলা, হিন্দি সবরকম থ্রিলার ফিল্ম দেখলাম। অনেক দেখে শুনে একটা চরিত্রের আইডিয়া পাওয়া গেল।

চরিত্রের নাম রাখলাম–অগ্নি। ছ'ফুট হাইটের এক মাঝবয়েসী লোক। হঠাৎ করে তার শখ হল ব্ল্যাকম্যাজিক নিয়ে গবেষণা করবে। সেই মতো কাজও করতে শুরু করল। ব্ল্যাক ম্যাজিকের উপর কাজ করতে করতেই একটা বই পড়ে জানতে পারল যে, মানুষের হৃৎপিণ্ড শয়তানকে উৎসর্গ করে, তারপর সেই প্রসাদ খেলে নাকি অমরতা লাভ করা যায়।

সেই বই পড়েই তার মাথা খারাপ হয়ে যায়। অমরত্বের লোভে সে আর মানুষ থাকলো না। শুরু হলো তার নারকীয় হত্যাকাণ্ড। প্রথমে

আশেপাশের লোক, কাজের লোক এমনকি নিজের স্ত্রী-পুত্রকেও সে ছাড়ে নি! সবাইকে খুন করে, তাদের হৃৎপিণ্ড শয়তানকে উৎসর্গ করে খেতে শুরু করেছিল! শেষ পর্যন্ত পুলিশ তাকে ধরে এবং তার ফাঁসি হয়।

এই হলো গল্পের মূল কাঠামো। ভাবনা আসা মাত্রই দাঁড় করিয়ে ফেললাম গল্পটাকে। সম্পাদক পাণ্ডুলিপি পড়ে খুব খুশি!বলেই ফেললেন–দাদা, যত লেখা আপনার পড়েছি, এটা হচ্ছে বেস্ট! দেখবেন, পাব্লিক একেবারে গপগপিয়ে খাবে।

সম্পাদকের প্রশংসা পেয়ে খুব খুশি হলাম। কিন্তু সে সুখ আমার কপালে সইল না।

সেদিন রাত্রে খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল। বাইরে ঝড়ের দাপাদাপি! মাঝে মাঝেই প্রচন্ড শব্দ করে বাজ পড়ছে। এমন সময় হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল।

আমি বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিলাম! ঘুম আসছিল না। পাশেই আমার স্ত্রী ও একমাত্র ছেলে ঘুমিয়ে কাদা। কিন্তু আমি ঘুমোতে পারছি না। কী যেন অস্বস্তি কাজ করছিল মনের মধ্যে!

আমার বেডরুমের জানলার কাঁচে মাঝেমধ্যেই বিদ্যুতের নীল আলো ঝলসে ঝলসে উঠছে। বাইরে যেন একটা নীল কুয়াশা কখন আস্তে আস্তে এসে জমাট বাঁধছিল! বৃষ্টির জলটাকেও যেন নীল মনে হয়!

ঘরে একটা মোমবাতি জ্বলছিল। তাও সেটার প্রায় ফুরিয়ে আসার সময় হয়েছে। একদম স্তিমিত আলোয় হঠাৎ মনে হল... কেউ যেন আমার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে।

অসম্ভব! কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না! চোখের সামনে কেউ নেই! অথচ দেওয়ালে ওটা তবে কার ছায়া!

প্রায় ছ'ফুট লম্বা একটা ছায়া! বেশ বুঝতে পারলাম তার পরনে ওভারকোট! মাথায় টুপি!

অবিকল তেমন...ঠিক তেমন...যেমন বর্ণনা আমি বইয়ে দিয়েছি! অগ্নির পরনেও এই পোষাকই থাকতো...! এই পোষাকই...

–তোমরা লেখকরা নিজেদের কি ভাবো...?

কানের কাছে একটা অদ্ভুত হিসহিসে আওয়াজ। যেন এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া শিস দিয়ে বলে উঠল–যতই অমরত্বের লোভ থাক–নিজের স্ত্রী-সন্তানকে খুন করা অত সহজ! নিজের হাতে নিজের আপনজনকে টুকরো টুকরো করে কাটতে কী প্রচন্ড কষ্ট হয়, তোমার বিন্দুমাত্রও ধারণা আছে?

আমি বুঝে উঠতে পারলাম না ঘটনাটা ঠিক কী ঘটছে! স্বপ্ন দেখছি! না সত্যিই এ সব আমার সাথে ঘটছে!

কিছু বোঝার আগেই সেই কণ্ঠস্বর আবার বলল–তুমিই আমাকে এই ঘৃণ্য অভিশপ্ত জীবন দিয়েছ। আমার হাত দিয়েই আমার সন্তানকে খুন করিয়েছ! আমি কষ্ট পেলেও কিছু করতে পারিনি! কারণ তুমি লেখক! যা করাবে তাই করতে হবে। এটাই নিয়ম! বলতে বলতেই সে নিষ্ঠুরভাবে হিসহিসিয়ে উঠল– এবার তোমাকেও তার দাম দিতে হবে। আমার জীবন এবার তুমিও একবার বেঁচে দেখো। আমি যা যা করেছি, সব এবার করে দেখবে তুমি। আর আমার মতোই তোমারও কিছু করার থাকবে না!

এতক্ষণ যেন আমার জ্ঞান ছিল না! এবার কথাগুলো শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠতে গেলাম!

ঠিক তখনই দপ্ করে মোমবাতিটা নিভে গেল! সঙ্গে সঙ্গেই কাছে প্রচন্ড শব্দে বাজ পড়ল! জানলাগুলো তার দাপটে কেঁপে ওঠে!

তারপর আর কিছু মনে নেই!

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই টের পেলাম পাশের বাড়িতে ভীষণ শোরগোল। কারা যেন ভীষণ কাঁদছে।

স্ত্রী বেড টি নিয়ে এসেছিলেন। কিছু বলার আগেই উত্তেজিত স্বরে বললেন– জানো, রথীনবাবুকে কাল কে যেন খুন করে গেছে!

রথীনবাবু আমাদের প্রতিবেশী!

–পুরো টুকরো টুকরো করে কেটেছে। আমার স্ত্রীর চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত–সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানো! ওনার হৃৎপিণ্ডটা নেই! কে যেন খুবলে তুলে নিয়েছে!

আমার মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরোল না! গত রাত্রের কথা মনে পড়ে গেল! টের পেলাম ভীষণ আতঙ্ক আমার বুকের ভিতরে চেপে বসছে!

বেড টি খেতে গেলাম। কিন্তু মুখে ভালো লাগল না। মুখ থেকে কেমন যেন বদগন্ধ বেরোচ্ছিল। অল্প অল্প গা গুলোচ্ছিল। কাঁচা মাংস খেলে মুখের স্বাদ যেমন হয়ে যায় টের পেলাম, মুখটা তেমনই হয়ে আছে!

ভাবলাম ব্রাশ করলেই ঠিক হয়ে যাবে। হয়তো হজম টজম ঠিক মতন হয়নি তাই এই...

বাথরুমে গিয়ে ব্রাশ করতে গিয়েই যা দেখলাম তাতে আমার পায়ের তলার মাটি সরে গেল!

আমার দাঁতে কালচে কালচে লাল ছোপ! শুকনো রক্তের দাগ যেমন হয়, ঠিক তেমন! আর জিভ...!

জিভটা পুরো লাল! রক্ত তখনও শুকিয়ে যায়নি!

আমি হতভম্ব! মনে হচ্ছিল এক্ষুনি পড়ে যাবো। আস্তে আস্তে বাথরুমের মেঝেতেই বসে পড়লাম!

বসে পড়তেই আরেকটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল। আমার বসে থাকা ছায়াটার পাস থেকেই আরেকটা দীর্ঘদেহী ছায়া ভেসে উঠেছে! ওভারকোট, টুপি পরা! ও ছায়া আমার নয়! হতেই পারে না। অথচ ছায়াটা ঠিক আমার পিছনেই...!

এরপরই ছায়াটা গোটা দেওয়ালে হেঁটে বেড়াতে শুরু করলো! ঠিক যেমন সরীসৃপ দেওয়াল বেয়ে বেড়ায়...তেমনিই সারা দেওয়ালে, ছাতে শরীর ঘেঁষটে বেড়াচ্ছে সে!

বুঝলাম ও আমায় নিষ্কৃতি দেবে না! সৃষ্টি এবার সষ্টাকে ধ্বংস করেই ছাড়বে!

কাউকে কিছু বললাম না। কিন্তু সারাদিন, সারারাত সেই ছায়া আমার সাথে। লেগেই থাকলো। কখনও সে আমার পিছন পিছন আসে, কখনও

দেওয়ালময় হেঁটে বেড়ায়! কিন্তু পিছু ছাড়ে না! আমার অদ্ভুত আচরণ দেখে স্ত্রী অবাক হলেন। কিন্তু ভাবলেন যে হয়তো রথীনবাবুর মৃত্যু সংবাদে আমি ভয় পেয়ে গেছি। তাই এমন অবস্থা!

এর ঠিক দুদিন পরের কথা!

আমাদের কাজের মেয়েটা সেদিন বিকেলে একটু দেরি করে এলো! সে নতুন একটা কাজ ধরেছে বলে এখন থেকে একটু দেরি হবে বলে জানালো।

আমার স্ত্রী-পুত্র সেদিন একটু বেরিয়েছিল। ঘরে একা আমিই ছিলাম। নতুন একটা লেখা নিয়ে ব্যস্ততার মধ্যেও ওকে ঘাড় নেড়ে জানাই যে খবরটা বৌদির কানে পৌঁছে দেবো!

–চা দেবো বাবু?

অন্যমনস্ক হয়ে বলি–দাও।

ও চলে গেল রান্নাঘরে। শুনতে পেলাম বাসনপত্রের আওয়াজ! বাসন মাজার শব্দ!

— কচি মেয়ে...কচি হৃৎপিণ্ড! হঠাৎ একরাশ ঠাণ্ডা হাওয়া আবার আমার কান ছুঁয়ে গেল! ফিসফিস করে বলল–

–কেমন লাগবে খেতে?

সেই শেষ কথা...বিশ্বাস করুন তারপর আমার আর কিছু মনে নেই! আমি কি করেছি না করেছি...কিছু বলতে পারবো না!

শুধু যখন জ্ঞান এলো তখন দেখলাম..

মেয়েটা আমার সামনে পড়ে আছে...ভীষণ আতঙ্কে চোখ দুটো খোলা... সারাঘরে রক্ত... আর রক্ত...! আমার গায়ে... মুখে... হাতে... সর্বাঙ্গে...

আর লাশের পাশে পড়ে আছে কিচেনের একটা ছুরি! সেটাও যেন রক্ত মেখে পাশবিক জিঘাংসায় হাসছে!

আমি কী করবো...কী করবো...লাশটা লুকোনো দরকার...রক্তটা মুছে ফেলা দরকার...নিজের হাত পা পরিষ্কার...

কোনটা আগে করবো? ভীষণ কান্না আর ভয় বুকের মধ্যে এসে ধাক্কা মারছে! ভয়ে, অনুতাপে কান্নায় ভেঙে পড়লাম! কী কষ্ট! মৃত্যুযন্ত্রণার মতো...!

আমি একটা জানোয়ার...জানোয়ার...! খুনী...সাইকো...ওঃ ঈশ্বর!

অনেকক্ষণ কান্নাকাটির পর মনের জোর ফিরে পেলাম। লাশটাকে স্টোররুমে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে ফেলি। স্টোররুমে এখন আর কেউ ঢোকে না! চতুর্দিকে শুধু ধুলো আর মাকড়সার জাল! সেখানেই বর্জ্য জিনিসপত্রের স্তূপে লুকিয়ে ফেললাম তাকে।

তখনই ফের নজরে পড়ল– সেই ছায়া! আমার ছোটখাটো চেহারার ছায়ার ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে আছে! হ্যাট-কোট পরা...লম্বা ছায়া...যেন তাকিয়ে দেখছে আমি কী করছি!

নাঃ, ওর কাছে হেরে যেতে পারবো না আমি! এক্ষুনি কিছু করতে হবে।

তাড়াতাড়ি সব দাগ মুছে ফেললাম। টয়লেটে ঢুকে স্নান করছি এমন সময় কলিংবেলের আওয়াজ। আমার স্ত্রী ফিরে এসেছেন। কোনমতে গা মুছে তাকে দরজা খুলে দিই। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে অবাক হলেন– তুমি এই ভর সন্ধ্যায় স্নান করেছ যে!

কী বলবো ভেবে পেলাম না। শুধু বলি–এই...মানে ইচ্ছে করল।

তিনি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমায় একবার মেপে নিলেন।

–ভারতী এসেছিল?

ভারতী আমাদের কাজের মেয়ের নাম।

ভয়ে কুলকুল করে তখনও ঘামছি। মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। কোনমতে বলি–ভারতী? কই... ন্‌ন্‌ন্‌নাঃ ...আসেনি তো!

স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বকবক করতে করতে কিচেনের দিকে গেলেন। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বেরিয়ে এসে বিস্মিত স্বরে বললেন–ভারতী আসেনি? তবে বাসনপত্র কে মাজলো?

কোনও উত্তর দিতে পারলাম না!

সেরাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর চুপিচুপি উঠে রান্নাঘরে গেলাম। যেখানে যত ছুরি, কাঁচি, ধারালো জিনিস আছে পাগলের মতো খুঁজতে শুরু করি। এক্ষুনি এগুলো সরানো দরকার! আমার নিজের উপর নিজেরই বিশ্বাস আর নেই। আমারই চরিত্র আমায় হারিয়ে দেবে! অসম্ভব! কিছুতেই হারবো না আমি ওর কাছে!

সমস্ত ছুরি, কাঁচি, কাটার জিনিসপত্র আঁতিপাতি করে খুঁজে জড়ো করলাম। তারপর প্যাকেট করে সব ফেলে দিলাম আস্তাকুঁড়েতে। কাল সকালে ময়লা তোলার লোক এসে নিয়ে যাবে প্যাকেটটা!

সমস্ত কাজ করার পর যেন অদ্ভুত স্বস্তিবোধ করলাম! এবার আর কিছু হবে! কিচ্ছু হবে না……! সব ঠিকঠাক আছে…সব ঠিক…

ঘুমিয়ে পড়ার আগে চোখে পড়ল সেই লম্বা ছায়াটা তখনও দেওয়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি তৃপ্তির হাসি হাসলাম–এইবার ওকে হারিয়েছি আমি! আর আমাকে ও কষ্ট দিতে পারবে না।

মনে খুব শান্তি নিয়ে ঘুমোতে গেলাম! চমৎকার ঘুম হল। কোন দুঃস্বপ্ন নয়, নিপাট সুখের ঘুম।

পরদিন বেশ দেরিতে ঘুম ভাঙে। তাকিয়ে দেখি বেলা এগারোটা বাজে! অবাক হলাম! সে কি! এত দেরী! আমার স্ত্রী আমায় ডাকেননি কেন! বেড টি ও বিছানার পাশে নেই! কী অদ্ভুত!

অবাক হয়ে উঠে বসতেই চোখে পড়ল দৃশ্যটা!

আমার দুই হাতে, সারা গায়ে রক্ত! সারামুখে……!

বুকের ভিতরটা ধ্বক করে উঠল…আমার আর দিগবিদিক জ্ঞান থাকলো না!…ছুটে গেলাম বাইরের ঘরের দিকে…নেই… কেউ নেই… আমার স্ত্রী…আমার ছেলে…কেউ নেই…ছাতে, বসার ঘরে, বাথরুমে, বাগানে… কোথাও নেই…

...হঠাৎ টেবিলের উপরে চোখ পড়ল! সেখানে একটা পাত্রে দুটো হৃৎপিণ্ড সাজানো! একটা বড়.....আরেকটা ছোট.....!

বলতে বলতেই হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন তপন মিশ–বিশ্বাস করুন! আমি...আমি সজ্ঞানে এসব করিনি! আমি কী করে নিজের সন্তানকে মারবো! কী করে আমি...নিজের হাতে নিজের ছেলেকে-স্ত্রীকে.....।

বাদবাকি কথাগুলো উচ্ছ্বসিত কান্নায় ঢেকে গেল। ডাক্তারবাবু রুদ্ধশ্বাসে তার কথা শুনছিলেন। অসম্ভব যন্ত্রণায় লোকটা বুকফাটা হাহাকার করে উঠল–

–আমার আর কেউ রইল না ডাক্তারবাবু...আমি...আমি... একটা জানোয়ার... একটা সাইকো...একটা ঘৃণ্যজীব...ও...ওঃ ভগবান... আমি... আমি ভাবলাম এবার কী করবো! এবার কি...বাঁচার আর কোন মানে রইলো না যখন...তখন কি করি! তখন...তখন...বেডকভারটা দিয়ে ফ্যানে ফাঁস এঁটে...ওঃ যন্ত্রণা! যন্ত্রণা!...আর পারছি না!...আমি আর পারছি না ডাক্তারবাবু...আমি...

–আপনি খুনি!

লোকটা অস্পষ্ট মুখ তুলে তাকায়। তার চোখ চকচক করে উঠল।

–আপনাকে এই মুহূর্তে পুলিশে দেওয়া দরকার।

–পুলিশে দেবেন? শান্ত গলায় তপন মিশ বলে–দিন। পুলিশে ফোন করুন। তাই ভালো...তাই ভালো।

টিমটিমে বাতিটার পাশেই একটা বড় আলো থাকে। রোগীরা সবসময় অন্ধকার পছন্দ করে বলেই বড় আলোটা জ্বালান না তিনি। এবার পুলিশে ফোন করার জন্য বড় আলোটার দরকার পড়ল!

কিন্তু আলোটা জ্বালিয়েই...চিৎকার করে উঠলেন ডক্টর সিনহা!

সব যেখানে থাকার–আছে। দেওয়ালে দুটো ছায়া তখনও মুখোমুখি বসে আছে! তপন মিশ্রের ধরানো সিগ্রেটটা তখনও জ্বলছে!

কিন্তু.....শূন্যে!

আর কেউ নেই!!!!!!!!!!

boierpathshala.blogspot.com

জলের দাগ

শেষ রাতের আকাশটায় তখন নীলচে আভা। নীলাভ ধোঁয়ার পাতলা চাদর অবিন্যস্তভাবে ঘুরে ঘুরে উড়ে চলেছিল আকাশের দিকে। সারারাত জ্বলে জ্বলে ক্লান্ত চাঁদ ঠাঁই নিয়েছে আকাশের এককোণে। জ্যোৎস্নায় ধোঁয়ার শরীর মাঝে মাঝে বড় অলৌকিক বলে মনে হয়। যেন একরাশ অপূর্ণ ইচ্ছের ছায়ামূর্তি চাঁদের আলোয় ভিজে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে– নিঃসঙ্গ, কায়াহীন ও অসহায়!

বড় বড় নিষ্প্রভ চোখদুটো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে কী যেন দেখছিল! দেখার বিষয় বলতে তেমন কিছু নেই। কলকাতার একটা পুরনো বাড়ির ঘর আর আশেপাশের উদ্বিগ্ন মুখ গুলো ছাড়া। একেবারে বিছানায় মিশে যাওয়া কঙ্কালসার মানুষটার আত্মীয় স্বজন অমোঘ উদ্বেগে দেখছিল পাঁজর সর্বস্ব বুকের ওঠাপড়া আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে আসছে। জীর্ণ ফুসফুস হাতড় হাতড়ে খুঁজছে অক্সিজেন। এমন বাতাসে ভরা পৃথিবীতে আজ শুধু এই একটি মানুষের জন্য এক ফোঁটা অক্সিজেনও বরাদ্দ নেই।

বড় কষ্টকর এই দৃশ্য! তবু দেখতেই হয়!

ডাক্তার একটু আগেই দিয়ে গেছেন শেষ জবানবন্দী

–অবস্থা খুবই খারাপ। আমি ইঞ্জেকশন দিয়ে গেলাম। কিন্তু কাজ কতদূর হবে..... তারপরই অনিশ্চিত অথচ বিষণ গলায় বললেন–আর হয়তো ঘণ্টাখানেক সময়.....।

ঘণ্টাখানেক সময়! ঘন্টাখানেক সময় কি আদৌ যথেষ্ট? একটি মানুষের দীর্ঘ পঁচাশি বছরের সমস্ত সাধ, সমস্ত আকাক্ষার গায়ে দাঁড়ি টেনে দেওয়ার জন্য এক ঘন্টা সময় কতটুকু! একদিকে পঁচাশি বছর– অন্যদিকে একঘণ্টা! তবু আজ বোধহয় সেই একঘণ্টাই পঁচাশি বছরকে মাত দেয়!

ফ্যালফ্যালে চোখদুটো ফের ঘুরল উপস্থিত সকলের দিকে। চোখের সামনে সবটাই আবছা। তবু দৃষ্টি বারবার খুঁজে বেড়াচ্ছিল কিছু নির্দিষ্ট মুখ। কার মুখ কে জানে! মানুষটার জীবনে যে মুখগুলো বারবার উঠে এসেছে সেই মুখের সারি তার চারিদিকে মজুত। অথচ এই মুহূর্তে তাদের কাউকেই মনে পড়ল না। বরং মনে পড়ে গেল এক বিরাট মাঠের কথা!...

সেই মাঠের বুকে কাশবন হাওয়ার সাথে খেলা করতো। মাঠের একপাশে ছিল স্বচ্ছ টলটলে বিরাট ঝিল। ঝিলের বুক থেকে উঠে আসা দামাল হাওয়ায় ঘুড়ি উড়িয়ে বেড়াত এক দুষ্টু কিশোর। কচি কচি ঘাসের উপর দিয়ে খালি পায়ে দৌড়ে যেত এক অদ্ভুত খেয়ালে। কখনও নারকেল বাগানে, কখনও আমবাগানে দস্যিপনা করে কেটে যেত দিন...।

— বাবা...বাবা...!

মস্তিষ্ক যেন সামান্য সাড়া দিয়ে উঠল। ইতস্তত এদিক ওদিক তাকিয়ে কি যেন খুঁজছে চোখ। এবার সামনে ঝুঁকে পড়া মুখটার দিকে ন্যস্ত হল।

–বাবা?

–উঁ?

–কী খোঁজো? কাকে খোঁজো?

ফের উদভ্রান্ত দৃষ্টি চতুর্দিকটা অদ্ভুত ঘোর নিয়ে জরিপ করতে শুরু করল।

–কী খুঁজছ বাবা?

ঘড়ঘড় একটা শব্দ। অতিকষ্টে গলা দিয়ে বেরোলো প্রশ্নের উত্তর—

–আমার দ্যাশ!

গল্প-১

মাঠের ওপ্রান্তে ছিল করিমচাচাঁদের বাড়ি। ছোট্ট একফালি সবুজ দিয়ে ঘেরা একটা অনাড়ম্বর মাটির ঘর। মাচায় লাউ, কুমড়ো লতায় পেঁচিয়ে

পেঁচিয়ে ফলে থাকতো। সামনের ছোট্ট সবজি বাগানটা করিমচাচা বড় সযত্নে গড়ে তুলেছিলেন। যখনই এক ছোট্ট বালক সেখানে গিয়ে হানা দিত, তখনই তার হাত ধরে আদর করে দেখাতেন–

–মনু, দেখছ নি? কেমন কাঁচালঙ্কা হৈছে গাছড়ায়?

উত্তরে আসত একটা ছোট্ট সবিস্ময় প্রশ্ন–এইডা কাঁচালঙ্কার গাছ চাচা?

–হঃ। তিনি সগর্বে মাথা নাড়তেন–এইবার ভাল ফলছে। দেখছো কেমনি লাল, সইবজা–টোপা টোপা হইছে। সোন্দর না?

মনু কোনওদিন বেশি প্রশ্ন করত না। অবাক হয়ে দেখত করিমচাচার মুখে শরতের আলো! মা বলত, করিমচাচারা নাকি বড় গরিব, অন্যের ক্ষেতে ভাগচাষী হয়ে খাটে। দুবেলা নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। অথচ ঐ মুহূর্তে মানুষটা যেন ঐশ্বরিক আনন্দে দেখিয়ে যেত একের পর এক তার সৃষ্টি।

–মাচায় কুমড়াখান কেমন হৈছে কও দেহি! তিনি সগর্বে ঘোষণা করলেন–লতিফের আম্মায় কইতাছিল–লতাখান বাঁচবো না! আমি কই, চাষার হাতে পড়লে ধানের তুষও কথা কয়! আর এ তো হইলো গিয়া একখান কুমড়ার লতা! বাঁচবোনা মানে! বাঁচাইয়াই তয় ছাড়ুম!

করিমচাচার কথায় ছোট্ট মনু ফিক করে হেসে ফেলে। সরল অনাড়ম্বর আন্ত রিকতায় তার ক্ষুদ্র হৃদয় ও প্রসন্ন হয়ে ওঠে। করিমচাচার মাটির বাড়িটাই যে কখন নন্দনকাননে পরিণত হয়–সে টেরও পায় না।

–সোন্দর হৈছে না মনু? নিবা নাকি?

সে দেশে কেউ কোনওদিন শিখিয়ে দেয় না যে অন্যের জিনিস কখনও নিতে নেই। কারুর অযাচিত স্নেহের দানের পিছনে সন্দেহতীক্ষ ভ্রূকুটির কথাও মনে পড়ে না। শুধু মায়ের সামান্য বকুনিটুকুর ভয়ে সে মিনমিন করে বলে– থাউক চাচা, মায় রাগ করবো। কইবো–হ্যাংলাপানা……!

— মা জননীরে আমি কইয়া দিমু সনা। মায় কিস্যু কইবো না। করিমচাচা তার মাথার চুল ঘাঁটতে ঘাঁটতে বলেন–তাইলে নিবা তো?

মনু হেসে ঘাড় কাত করে দেয়। তিনি যেন স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করেন। যেন তার সোনার ফসলের প্রথম ভাগটা কোন দেবতার হাতে সমর্পন করছেন। স্বার্থহীন দেওয়ার মধ্যে যে এত আনন্দ তা বোধহয় করিমচাচার কাছেই শিখেছিল তার স্নেহের মনু।

এমনই ছিলেন করিমচাচা। হঠাৎ হঠাৎই কথা নেই বার্তা নেই এসে পড়তেন বাড়িতে। কখনও ঘাড় থেকে নামতে কলার কাঁদি, কখনও রাঙা আলু, কখনও বা লাউ, কুমড়ো। কখনও আবার হাঁকডাক করে বলতেন– অ-মা জননী। মনু আইজ আমাগো ঘর খাইবে। ঈদের নিওতা দিলাম।

মা আশ্চর্য হয়ে যেতেন। আশ্চর্য হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। যে মানুষটার নিজেরই অন্ন সংস্থান নেই সে যখন হাসিমুখে এসে খাওয়ার নিমন্ত্রণ দেয় তখন অবাক লাগেই বটে। কখনও কখনও জানাতেন মৃদু প্রতিবাদও–

–না করিম, এইবার থাউক গা।

–না মা, এইডা তুমি কি কইলা?থাকবো না। করিমচাচা জোরালো গলায় বলতেন–মনুরে পাঠায়া দিও। কোন কথা শুনুম না।

অগত্যা। মা একটু দ্বিধা করতেন বটে। কিন্তু মনুর কোন দ্বিধা ছিল না। সময় হলেই সে নাচতে নাচতে বাবার হাত ধরে পরমোৎসাহে গিয়ে হাজির হত করিমচাচার বাড়ি। ডাল, ভাত, ভাজাভুজি, ঝাল ঝাল মাংসের ঝোল আর শিমুইয়ের পায়েস প্রায় অমৃতজ্ঞানে খেতো। করিমচাচার মুখে শুনতো পদ্মাগাঙের ডাকাতদের গল্প। যারা বহু বছর আগে নৌকো করে নদীর বুকে ভেসে বেড়াত, আর বড়লোকদের বজরা দেখলেই লুটে নিত। একেকজনের ইয়া মস্ত বড় গোঁফ ছিল। ভাঁটার মত লাল চোখ আর বুক প্রায় পিপের মত চওড়া।!

–চাচা, তুমি ডাকাইত দেখো নাই?

–খুব দেখছি মনু।

–আমারে দ্যাখাবা?

–দেখামু হনে।

–কবে দ্যাখাবা?

করিমচাচা একটু ভেবে উত্তর দিতেন–ডাকাইত দ্যাখলে তুমি ডর খাবা না তো মনু?

মনু বুক ফুলিয়ে বলতো–ভয় পামু ক্যান? উল্টা দিমু একখান চোপাড়!

তিনি হো হো করে হেসে উঠতেন। মনুর বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলতেন–শোনছেন নি কত্তা? কী কয় আপনের পোলায়! বড় হইয়া আমাগো মনু দারোগা হইবো হনে।

এরপর থেকে করিমচাচার সাথে প্রায়ই গোপনে গজল্লা হত। কোথায় ডাকাত দেখতে যাবে, কেমন করে যাবে–ইত্যাদি ইত্যাদি...।।

আর সাথে সাথেই উঠে আসত একটাই প্রশ্ন–ডাকাইত কবে দ্যাখাবা আমারে...ও চাচা!

সহাস্য উত্তর–এই তো, দেখামু।

শেষপর্যন্ত আর ডাকাত দেখা হয়নি মনুর। পরের বর্ষাতেই কি এক অজানা জ্বরে তিনদিন ভুগে সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন করিমচাচা। এক অদৃশ্য ডাকাত তাকেই ছিনিয়ে নিয়ে গেল সবার কাছ থেকে।

শেষের দিকে করিমচাচাকে কেমন যেন ফ্যাকাশে সাদা ঘুড়ির মতো লাগছিল। এক্ষুনি যেন উড়তে উড়তে কোথায় হারিয়ে যাবে।

করিমচাচার বৌ, ছেলে লতিফ খুব কাঁদছিল। মনু বুঝতে পারেনি কি জন্য সবার এত মন খারাপ। সে প্রশ্ন করেছিল–

–চাচা, তোমার কি হৈছে?

ক্লিষ্ট হেসে উত্তর দিয়েছিলেন চাচা–কিছু হয় নাই বাপ।

–তয় চাচি কাঁদে ক্যান?–আমার তবিয়ৎ খারাপ–তাই কাঁদে।

একটু আস্বস্ত হয়ে ফের সেই প্রশ্নটা করল সে–আমারে ডাকাইত দ্যাখাবা?

অদ্ভুত অর্থপূর্ণ হাসি হেসেছিলেন করিমচাচা। তখন সে হাসির অর্থ। বোঝেনি। পরে বুঝেছিল ওটা ফাঁকি দিতে পারার আনন্দের হাসি।

করিমচাচা ফাঁকি দিয়েছিল। কথা রাখেনি।

গল্প ২

সে দেশে আকাশটা বিরাট বড় ছিল। তেমন আকাশ বোধহয় আর কোথাও দেখা যায় না। শান্ত আকাশের গায়ে রোদের ঝিকিমিকি হাসি। নীচে কলকল ছলছল করে তরঙ্গে তরঙ্গে বয়ে চলেছে পদ্মানদী। আকাশের সাথে এমন ভাবে দিগন্তে মিশেছে যে দেখলে চমকে যেতে হয়। মনে হয় আকাশটাই যেন চঞ্চল হয়ে নেমে এসেছে পদ্মার গা বেয়ে। দুই বিশালত্ব একাকার হয়ে মিলে গেছে। অসীমে!

বিকেলের আলো পদ্মায় চুঁইয়ে পড়ত। পদ্মার দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি তখন পড়ন্ত রোদের আদরে চিকমিক করে উঠত। আদুরে সোতে অভ্রমাখা আঁচল উড়িয়ে কখনও ঘূর্ণনে, কখনও সরলরেখায় ছপছপ করে নেচে চলে সে।

তার পাড়ে বসে মুগ্ধ চোখে সেদিকেই তাকিয়ে থাকত দুই কিশোর। আস্তে আস্তে সন্ধে হয়ে আসে। জেলেদের নৌকোর বাতিগুলো মিটমিট করে জোনাকির মত জ্বলে ওঠে। মাঝেমধ্যে নদীর বুক থেকে উঠে আসা কুয়াশা ম্লান করে দিত সে দ্যুতি। কিন্তু সে অস্পষ্টতা ক্ষণস্থায়ী। কিছুক্ষণ পরেই ধোঁয়াসা কেটে প্রকট হয়ে ওঠে টিমটিমে আলোর বিন্দু। মনে হত আকাশের তারাগুলো আকাশ বেয়ে বুঝি নেমে এসেছে নদীর জলে!

আলোর মালায় সেজে উঠতো পদ্ম। আর তার কালো জল মসৃণ গতিতে চলতে চলতে আওয়াজ তুলতো ছপছপ!

–মিতা... সিরাজ তার কোঁচড় থেকে বের করে আনতে পানিফল। মিতার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলতো–আমি বড় হইয়া মাঝি হমু। তুমি কী হইবা?

মিতা তখনও ভেবে উঠতে পারেনি বড় হয়ে সে কি হবে! সে নির্বিবাদে একটা পানিফল মুখে পুরে দিয়ে বলে–কখুনও ভাবি নাই–কিন্তু তুমি মাঝি হইবা ক্যান?

সিরাজের মুখে মাঝিদের নৌকোর আলো ঝলমল করে উঠত। তার একটা ভেঁপু ছিল। ঐ ভেঁপুটা বোধহয় তার প্রাণের থেকেও প্রিয়। সবসময়ই তার কোমরে গোঁজা থাকতো। সেই ভেঁপুতে গোটা কয়েক টান মেরে বলতো সে– আমি পদ্মায় নাও বাইয়া বেড়ামু। জাল ফালাইয়া ইলশা ধরুম। আর দিবারাত্তর গলা ছাইড়া গান গামু। দ্যাখো নাই? মাঝিরা কি সুখেই না গান গায়! পদ্মার পানিতে কি সুখ মিতা, জানো নাই!

–তয় আমিও মাঝি হমু।

সিরাজ মায়া জড়ানো হাসি হাসে– না, তুমি মাঝি হবা না। তুমি অনেক বড় হইবা! জজ ম্যাজেস্টর হইবা! আমাগো মুখ রওশন করবা।

মিতার একটু সন্দেহ হয়। জজ ম্যাজিস্ট্রেট হলে সিরাজের সাথে আর দেখা হবে কি? সে কথা বলতেই সিরাজ ফের হাসে–ক্যান? দ্যাখা হইবো না ক্যান? আমি মাছ ধইরা তোমারে দিমু, আর তুমি খাবা!

ব্যস, এইটুকুতেই নিশ্চিন্ত!

এভাবেই সন্ধেটা কাটত। নদীর পাড়ে বসে, কখনও ভেঁপু বাজিয়ে, কখনও সুখ দুঃখের কথা বলে। সিরাজ প্রায়শই বলতো–বোঝলা মিতা, আব্বাজান আমারে মেলায় এই ভেঁপুড়া দিছিল। আর তারপরই কলেরায় লোকডা মইরা গেল। আমাগো ঘরে দামী কিস নাই। থাকনের মধ্যে এই ভেঁপুডা! এডারে আমি মরলেও ছাড়ুম না। এইডা আমার আব্বাজানের চিহ্ন।

আর সকালবেলাটা কাটত ঘুড়ি উড়িয়ে। বিস্তৃত মাঠের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি সিরাজ আর তার মিতা খালি পায়ে দৌড়ে বেড়ায়……

–মিতা-আ-আ! তোমার ঘুড়ি কাটছে…কা-ট-ছে রে-এ-এ……।

এরপরই শুরু হত প্রতিযোগিতা। কে আগে গিয়ে কাটা ঘুড়ি ধরতে পারে।

মাঠের নরম শিশিরবিন্দু এই কাণ্ড দেখে ঝলমলিয়ে হাসত। ঝিলের বুক থেকে হু হু করে হাওয়া এসে লুটোপুটি খেত দুই কিশোরের গায়ে। জলে

বড় বড় শালুক অবাক হয়ে চেয়ে দেখত সেদিকেই। সোনালি রোদ যেন আকাশের অনাবিল আনন্দধারার মত গলে গলে পড়ত!

খোলা মাঠে, তাজা শিশির পায়ে মাড়িয়ে ছুটে চলেছে দুজনে। দুজনের খিলখিল হাসি খোলা মাঠ ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে খোলা আকাশে। কাটা ঘুড়ি বাতাসের টানে গোঁত্তা খেতে খেতে পড়ল গিয়ে পুঁটে গাজিদের বাগানে! আটকে গেল গাছে।

পুঁটে গাজিদের বাগান আলো করে ফলে থাকতো কুল, বৈচি, আমড়া! থোকায় থোকায় পাকা কুল ঝুলত বোঁটায় বোঁটায়।

–রও মিতা, আমি দেখতাছি...

চোখের পলকে ভেঁপুটা কোমরে গুঁজে তরতর করে গাছ বেয়ে উঠে যায় সিরাজ! একহাতে কাটা ঘুড়ি ধরে আরেকহাতে পটাপট ছিঁড়ে নিত কুল। একটা করে নিজের মুখে পুরতো, আর গুচ্ছ গুচ্ছ ফল ছুঁড়ে দিত নীচে– যেখানে কোঁচড় পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার মিতা।

–এই ক্যাডা! ক্যা-ডা-রে?

হঠাৎই বাগানের ওপ্রান্ত থেকে ভেসে আসে কর্কশ চিৎকার। সিরাজ ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখে উল্টোদিক থেকে বিদাৎবেগে ছুটে আসছে পুঁটে গাজি! খালি গা, পরনে লুঙি আর পায়ে একজোড়া শতছিন্ন বুটজুতো!

এই বুটজোড়া তাকে কে দিয়েছিল কে জানে! কিন্তু সর্বক্ষণই সে বুটজুতো পরে থাকতো।

–পলাও...পলাইয়া যাও মিতা!

উপর থেকে চেঁচিয়ে বলে সিরাজ। কিন্তু সিরাজের মিতা অনড়! সে বন্ধুকে ছেড়ে যাবে না!

কোনমতে তড়বড় করে গাছ থেকে নেমে আসে সিরাজ। বন্ধুর হাত কষে ধরে বলে–পলাও।

পুঁটে গাজি ততক্ষণে কাছে এসে পড়েছে। দূর থেকে তীর্ণ কর্কশগলায় চিৎকার করে বলে–হালা নি-ব্বেং-শা! চুরি করতাছ! হা-লা, কাইট্টাই ফেলুম!

বলেই ছেলেদুটোর পিছনে তাড়া করে। কিন্তু তাড়া করে আর কতক্ষণ পারবে! দুজনেই বয়েসে নবীন। দুরন্ত গতিতে মুহূর্তের মধ্যে পুঁটে গাজিকে পিছনে ফেলে ছুটে চলল। বাগান পেরিয়ে, ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে দুই ধারে সোনালি ধানক্ষেত যতদূর চোখ যায় চলে গেছে। সেই আলের উপর দিয়ে দুই বালক হাত ধরাধরি করে দুষ্টুমি ভরা খিলখিল হাসি হাসতে হাসতে ছুটেই চলেছে...ছুটেই চলেছে!

পুঁটে গাজি কিছুদূর ধাওয়া করেও ধরতে পারতো না দুই চোরকে। নিষ্ফল আক্রোশে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বলত–হা-রা-ম-জা-দা!

দুজনেই ফের হেসে ওঠে। সিরাজ তার ভেঁপুটা বিজয় আনন্দে বাজায়। তারপর আলের উপর দাঁড়িয়েই পুঁটে গাজিকে খুব একচোট মুখ ভেঙচে ফের পালিয়ে যায়।

সিরাজের অভ্যাসই ছিল পরের বাগানে ডাকাতি করা! এর বাগান থেকে কয়েৎবেল, ওর বাগান থেকে আমড়া কিংবা কাঁচা আম–রোজই সে কিছু না কিছু চুরি করে আনত। ফলস্বরূপ কপালে মারধোরও জুটত। অনেকবার তার মিতা দেখেছে যে সিরাজের গালে পাঁচ আঙুলের দাগ, কপালে কালসিটে!

সে উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চায়–তুমি আইজ আবার মাইর খাইছো?

সিরাজ কুলকুল করে হাসত–মাইর যত না খাইছি, লগে ফলও খাইছি বিস্ত র। তুমার লাইগ্যাও আনছি।

বলেই কোঁচড় থেকে বের করে দিত সব চুরির সম্পদ। দুজনে মিলে পদ্মার ধারে বসে সেই ফল খেত, ভেঁপু বাজাত আর গল্প করত। সিরাজ উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত নদীর দিকে আর বলত–

–দেইখ্যো, আমি ঠিক মাঝি হমু। আর তুমারে নাও এ লইয়া মাঝদরিয়ায় যামু। হেইখানে গিয়া আমি গান গামু আর তুমি ভেঁপু বাজাইবা! তোমাগো

কেষ্টঠাকুর যেমনি বাঁশি বাজায়, তুমিও তেমনি কইরাই ভেঁপু বাজাইও মিতা। এ গাঙের পানিতে ভেঁপুর সুর বড় মিঠা লাগে।

–কিন্তু আমি তো ভেঁপু বাজাইতে পারি না!

–আমি পারি। সিরাজ হেসে বলেছিল–আমি তুমারে শিখাইয়া দিমুনে।

এরপর পদ্মার জল অনেকদূর গড়িয়েছে।

সিরাজের মিতার বাবা প্রথমে কর্মসূত্রে ঢাকায় চলে গেলেন। কয়েকদিন বাদে ফিরে এসে তার পরিবারকেও নিয়ে গেলেন।

যাওয়ার আগের দিন সিরাজ এসেছিল। ছলছলে চোখে বলেছিল—

–তুমি আর এইহানে থাকবা না?

মিতার চোখেও জল ছলকে উঠেছিল। ধরা গলায় বলে–বাবায় কয় আমাগো ঢাকা লইয়া যাইব। আমরা এহন হৈতে ঐহানেই থাকুম।

–ভালা... সিরাজ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিল–আমি শহর দেখি নাই। তুমি দ্যাখবা। ফিরা আইস্যা কইও শহরে কি কি দ্যাখলা। আসবা না?

সে মাথা নাড়ে–আসুম।

–আর... সিরাজ তার অতিপ্রিয় ভেঁপুটা বের করে এনেছে–এইহান রাহো।

মিতা অবাক হয়েছিল! এই ভেঁপুটা সিরাজের প্রাণ! সে একমুহূর্তও ওটাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। অথচ.....!

ভেঁপুটা তার হাতে গুঁজে দিয়ে কান্নামাখা হাসি হেসেছিল সিরাজ–এডারে সামলাইয়া রাইখ্যো। তুমারে দিলাম। যেমনি এডারে বাজাবা, তেমনি আমারে মনে করবা। আমারে ভোলবা না তো মিতা?

মিতা মাথা নাড়িয়ে জানিয়েছিল, কোনওদিন ভুলবে না।

পরদিন ভোরে সমস্ত বাক্স প্যাঁটরা গুছিয়ে রওনা হল ওরা। গরুর গাড়িতে যেতে যেতে সে দেখেছিল রাস্তার সমান্তরাল আলপথ দিয়ে ছুটে আসছে সিরাজ। যতদূর যাওয়া সম্ভব ততদূর সে গাড়ির পিছনে ছুটতে ছুটতে এসেছিল। আর চিৎকার করে ডেকেছিল–

–মি-তা-আ-আ-আ.....মি-তা-আ-আ-আ-আ.....মি-তা-আ-আ-আ আ.....।

ভেঁপু বাজানো আর শেখা হয়নি মিতার!

গল্প-৩

–বরিশালে দাঙ্গা লাগছে দাদাভাই!

ইসমাইল ভাইজানের কথাটা শুনে থ হয়ে বসেছিল দাদাভাই! এ তো লাগারই ছিল! দেশের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল অনেকদিন থেকেই। হিন্দু মুসলিম সম্পর্কে আস্তে আস্তে চিড় ধরেছে। সময়ের সাথে সাথেই ঘনিয়ে আসছিল তীব্র সঙ্কট! তার মধ্যেই গোটা বাংলা দু-টুকরো হয়ে গেল। ও পারের নাম হল পশ্চিমবঙ্গ। আর এপার–পূর্বপাকিস্তান!

তোড়জোড় আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। দাঙ্গা লাগতেও সময় লাগল না। দাঙ্গা ক্রমশই বিধ্বংসী রূপ নিচ্ছে। কোথাও শান্তি নেই–জনজীবনে থাবা বসাতে শুরু করল তীব্র আতঙ্ক।

তবুও সে কখনও ভাবেনি কোনদিন এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। তার বাবা প্রথমে চাকরিসূত্রে ঢাকায় এসেছিলেন। পরে নিজেই কাঠের ব্যবসা ফেঁদে বসেন। অসম থেকে নদীর জলে ভেসে আসত কাঠ। সেই কাঠকেই প্রায় সোনায় পরিণত করলেন তার বাবা। ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠল।

বাবা গত হওয়ার আগেই তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। বাবার পর সে-ই ব্যবসার হাল ধরল। আপাতত সে বাড়ির কর্তা। সদ্যোজাত সন্তানের বাবা, এবং একজন বড়সড় ব্যবসায়ী।

তাদের পাশের বাড়িতেই থাকেন ইসমাইল ভাইজান আর রেশমাভাবি। ইসমাইল তার থেকে বয়েসে বড় হলেও আদর করে তাকে দাদাভাই ডাকতেন। ঈদ উপলক্ষ্যে প্রত্যেকবারই থলে হাতে এসে হাঁকাহাঁকি শুরু করেন– দাদাভাই–দা-দা-ভাই! কই গেলা!

দাদাভাই ত্রস্তব্যস্ত হয়ে ছুটে আসত–হ ভাইজান, কি হইছে?

–হইছে আমার মুণ্ডু। ইসমাইল হাতের থলে থেকে বের করতেন নতুন ধুতি, পাঞ্জাবি, শাড়ি আরও কত কি!

–নাও, এইগুলান রাইখ্যা আমারে উদ্ধার করো।

সে বিব্রত হয়ে বলে–ভাইজান, আবার কি আনছো?

–তক্কো কইরো না। তিনি ছদ্মরাগ দেখিয়ে বলতেন–মুখে ভাইজান কও। আর কামের বেলায় লবডঙ্কা! ভাইজানের সওগাত লইতে শরম হয় বুঝি?

এরপর আর কি বলা চলে! অগত্যা দাদাভাই থলেটা নিয়ে সুড়সুড় করে ভিতরবাড়িতে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরেই ভিতর থেকে মায়ের আবির্ভাব–

–ইছমাইল, তুই কিন্তু কাইল এইহানেই খাইয়া যাইস। আমার বত্ত আছে। আর একা আইবি না। তর বিবিরে লইয়া আইস।

–এই, মা! তোমার হুকুমের লাইগ্যা বইস্যাছিলাম। ইসমাইল আকর্ণবিস্তৃত হাসি হাসেন–কইছো যখন, তখন দুইডায় মিল্যা কাইল তোমার অনুধ্বংস না কইরা নড়ুম না! মায়ের হুকুম তামিল না কইরা কি দোজখে যামু?!

এই ইসমাইল ভাইজানই প্রথম এনেছিলেন দুঃসংবাদটা। বিষণ মুখে বলেছিলেন–

–দাদাভাই, ভালা বুঝি না। বরিশালে জব্বর দাঙ্গা লাগছে। মোল্লারা ঘুঙুর পইরা, মুখোশ পইরা হিন্দু কাটতাছে। হগলডি কয় দাঙ্গা এহানেও লাগবো।

কথাটা শুনেই বুকের ভিতরটা ধ্বক করে উঠল তার। এর আগেও নোয়াখালিতে বিরাট দাঙ্গা লেগেছিল। দাঙ্গায় মারা গিয়েছে অসংখ্য হিন্দু। তাদের ঘর আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা প্রাণে বেঁচেছে তারা এক কাপড়ে ও দেশে পালিয়ে গেছে। অনেকে পালালেও পৌঁছতে পারেনি। মাঝরাস্তাতেই তাদের রামদা, তলোয়ার দিয়ে কুপিয়েছে দুর্বত্তরা!

দেশ ভাগ হওয়ার পর থেকেই যে অশান্তি ধিকিধিকি জ্বলছিল, তা একেবারে চরমে উঠল। অনেকের মুখেই শোনা গেল–এটা নাকি হিন্দুদের দেশ নয়! তাদের দেশ ভারতবর্ষ। আর এটা পূর্বপাকিস্তান! মুসলিমদের দেশ!

সেই শোনা কথাটাই অপরিসীম বেদনা নিয়ে উঠে এসেছিল দাদাভাইয়ের মুখে–

–ভাইজান, এডা কি আর আমাগো দ্যাশ নাই? এই ধানক্ষেত নদী মাঠ খাল-বিল দেইখ্যা বড় হইছি। এইহানে আমাগো বাপ পিতামো চোইদ্দ পুরুষের ভিটা! এই দ্যাশের ভাষায় কথা কই! রক্তে রক্তে পদ্মা বয়! তবু মানষে কয়-এই দ্যাশ আর আমাগো নাই! এই ভিটা ছাইড়া যাইতে কয়। যে দ্যাশডারে জনমে চক্ষেও দেখি, হেইডা নাকি আমাগো দ্যাশ!

চোখ ফেটে টপটপ করে জল পড়েছিল দাদাভাইয়ের। বুকের ভিতরের হাহাকার যেন গলা চুঁইয়ে পড়ল– আর কি করলে এই দ্যাশডা আমাগো হইবো কইতে পারো ভাইজান?

ইসমাইলের গলাও ব্যথায় ঝুঁজে এসেছিল। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

–দাদাভাই, একটু সজাগ থাইকো। তোমাগো বড় ঘর। দাঙ্গা হইলে বিপাকে পড়বা। উয়ারা লুঠতরাজ করতে আছে। তোমাগো ছাড়বো না।

–কারা ছাড়বো না?

–মোছলমানেরা।

কান্না ভেজা রাঙা চোখ দুটো তুলে বলেছিল দাদাভাই–তয় ভাইজান, তুমিও তো মোছলমান!

ইসমাইল স্তম্ভিত হয়ে যান। কী বলবেন বুঝতে পারেননি। তার চোখের পাতাও ভিজে গিয়েছিল। ধরা গলায় শুধু বললেন–হ, হক কথা কইছ বটে।

তারপর আস্তে আস্তে চলে গিয়েছিলেন। তার আদরের দাদাভাই তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে দেখেছিল অমন টানটান লম্বা চেহারার মানুষটা যেন শুধু একটা কথার ভারেই কুঁজো হয়ে গিয়েছে!

এরপর ভীষণ আতঙ্কে কেটে যায় কয়েকটা দিন। চতুর্দিকে কেমন যেন থমথমে পরিবেশ। বেতারে একের পর এক দুঃসংবাদ! সে খবর শুনে বজ্রাহত গাছের মত থ হয়ে যেত দাদাভাই। মনের ভিতরে আঁচড়ে বেড়াত একটা ভয়। তার ঘরে মৃদ্ধা মা, যুবতী বৌ আর সদ্যোজাত শিশু। কী হবে এদের?

অবশেষে সে রাতটাও এলো! কোনদিন সেই রাতটার কথা ভুলতে পারবে না সে!

তখন ঘড়িঘরে ঢংটং করে বারোটার ঘন্টা বাজছে। এক একটা ঘন্টার সাথে হৃৎপিণ্ড যেন নেচে নেচে উঠছিল। এই ঘড়িঘরে রোজই ঘন্টা পড়ে। কিন্তু কোনওদিন সে আওয়াজ এত ভয়ঙ্কর মনে হয়নি! সেদিন মনে হচ্ছিল, ঘন্টাগুলো যেন আসন্ন প্রলয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে!

ঘড়িঘরে বারোটার ঘন্টা পড়া শেষ হওয়ামাত্রই আকাশ ফাটানো চিৎকার ঘুমন্ত শহরের হাড়-পাঁজর কাঁপিয়ে দিল। চতুর্দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে হতে ফিরল গায়ের রক্ত হিম করা রব–

–আ-ল্লা হো-ও-ও-ও আ-ক-ব-র!

মুহূর্তের মধ্যে তার মনে হল বোধহয় সে আর বেঁচে নেই! দেহটা বড় ভার লাগে। পা দুটো যেন লোহার বেড়ি দিয়ে কেউ বেঁধে দিয়েছে! কী করবে, কোথায় যাবে কিছুই যেন ভাবতে পারছে না। শুধু কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত জানলা দিয়ে দেখল অনতিদূরের হিন্দুবাড়িগুলোয় জ্বলে উঠেছে আগুন! লেলিহান শিখা ধূমায়িত হয়ে লকলক করে উঠছে! তরোয়ালের ঝনঝন শব্দ, নারী-পুরুষের আর্তচিৎকার আর উন্মত্ত হুঙ্কারে ভরে উঠল আকাশ বাতাস। মৃত্যুভয়ে সবাই ছুটে বেড়াচ্ছে দিগবিদিকে! পিছনে উদ্যত রামদা নিয়ে দুর্বৃত্ত!

সেই আওয়াজে পাশের ঘর থেকে ছুটে এসেছেন মা। স্ত্রী সচকিত হয়ে উঠে বসেছে। কোলের ছেলেটা জেগে উঠে তীক্ষ্ণ গলায় কান্না জুড়ল।

মা আর স্ত্রীয়ের ভয়ার্ত দৃষ্টির উত্তরে সে নিষ্প্রাণ ও হতবুদ্ধি স্বরে বলে– দাঙ্গা লাগছে।

কথাটা শেষ হতে না হতেই পিছনের দরজায় প্রবল করাঘাত! উগ্র, দ্রুত হাতে কেউ কড়া নাড়ছে–

–ঠক..ঠ...ঠক...

–কে? ভীত, চাপা গলায় মা বললেন–কে কড়া নাড়ে?

সে ঠোঁটে আঙুল রেখে আওয়াজ করতে বারণ করে। দরজার শব্দের সাথে যেন বুকের ভিতরে কেউ হাতুড়ি পিটছে। আস্তে আস্তে দরজার সামনে গিয়ে কান পেতে বোঝার চেষ্টা করল ও প্রান্তে ঠিক কি অপেক্ষা করছে!

ওপ্রান্ত থেকে কিন্তু কোন হুঙ্কার ভেসে এলো না। এলো না কোন তীব গর্জন। শুধু একটা পরিচিত স্বর ফিসফিস করে বলল–

–দাদাভাই...জলদি দোর খুলো...আমি আইছি...আমি... তোমার ভাইজান।

দাদাভাই নিমেষের মধ্যে দরজা খুল দিয়েছে। বিদ্যুৎগতিতে ঘরে ঢুকে পড়ে ইসমাইল উত্তেজিত স্বরে বললেন–কথা কওনের সময় নাই। হাতের কাছে যা পাও সবডি লইয়া আমাগো ঘর চলো। দাঙ্গা লাগছে। অরা আওনের আগে পিছের দোর দিয়া পলাইতে হইবো। জলদি করো।

তখন ভাবার সময় সত্যিই ছিল না। একবস্ত্রে, হাতের কাছে যেটুকু নামমাত্র টাকা পয়সা, সোনাদানা পেল সেটুকু নিয়েই তারা উঠে এলো ইসমাইলের বাড়ি। পিছনের দরজা দিয়ে পালাতে পালাতেই শুনল সামনের দরজা ভাঙার শব্দ! তার সাথে সাথেই তীব্র উন্মত্ত চিৎকার–

–আ-ল্লা হো-ও-ও-ও আ-ক-ব-র!

দুর্বৃত্তরা ঘরে ঢুকে কাউকে পেল না। নিষ্ফল আক্রোশে তারা বাড়ি ভাঙচুর করল। জিনিসপত্র যা লুটে নেওয়ার, তা নিয়ে শেষে গোটা বাড়িতেই আগুন ধরিয়ে দিল।

ইসমাইলের বাড়ির জানলা দিয়ে তিনটে মানুষ সজল চোখে দেখল তাদের এতদিনের তিলতিল করে গড়ে তোলা স্বপ্ন, সাধ, আকাঙক্ষা–সব পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে! আর সেই মর্মান্তিক ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করতে করতে উল্লাসে চিৎকার করছে কতগুলো নির্বোধ জানোয়ার!

মা এই দৃশ্য দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন। তার সাধের ফলন্ত সংসার এভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে দেখে কান্না চাপতে পারেননি।

–কাইন্দো না মা। ইসমাইল সান্ত্বনা দেন–মানষের পরানডা আগে। পরানে বাঁচলে আবার সবকিছু হইবো। কাইন্দো না।

–ইছমাইল। কান্নাজড়ানো গলায় মা বলেন–অগো কী ক্ষতি করছি আমরা...?

ইসমাইল তার উত্তর দেন না। চুপ করে নির্বাক মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিলেন।

–ভাইজান...অরা আবার তোমাগগা ঘরে হামলা করবো না তো? প্রচন্ড আতঙ্কে বলেছিল দাদাভাই–আমাগো লাইগ্যা তুমি এত বড় ঝুঁকি নিবা?

–হ, নিমু। ইসমাইল শান্ত স্বরে বলেন–তুমি হক কথা কইছিলা দাদাভাই। আমি মোছলমান। আমার ধম্ম আমারে মারতে শিখায় নাই! মানষেরে ভালোবাসতে, বাঁচাইতে শিখাইছে। যারা মানষ হইয়া মানষেরে মারে–তারা পাপী। পাপীর কুননা জাত হয় না...ধম্ম হয় না।

তিনি একটু থেমে ফের দৃঢ় স্বরে বললেন–আমি আমার ধম্ম পালন করুম। যতক্ষণ আমার দ্যাহে জান আছে কেও তোমাগো কিস্যু করতে পারবো না–আল্লার নামে এই কসম খাইলাম।

কসম রেখেছিলেন ইসমাইল। দুষ্কৃতীরা কি করে যেন জানতে পেরেছিল যে তার বাড়িতেই লুকিয়ে রয়েছে একঘর হিন্দু। সহজে ছাড়তে চায়নি। কিন্তু ইসমাইল প্রভাবশালী লোক ছিলেন বলে হামলা করতেও সাহস করেনি। শুধু একরাতে কয়েকজন মুখোশধারী এসে বলেছিল–মিঞাঁ, তোমার লগে আমাগো কুনো দুশমনি নাই। কিন্তু মোছলমান হইয়া ঘরে হিন্দু লুকায়ে রাখছো। অগো বাইর কইরা দাও। নয় তোমারেও ছাড়ুম না।

–হা-লা, শুয়ারের বাচ্চা, হা-রাম-খো-র! একহাতে রামদা আরেকহাতে ল্যাজা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন ইসমাইল। দু চোখে ধকধক করে জ্বলে উঠেছিল আগুন–

–কারোর ঘর পোড়ে–কেউ খই খাও! মজা পাইছো! হিম্মত থাকলে হালা, আগায়ে আয়। আইয়া দ্যাখ–এই ল্যাজা আর রামদা দিয়া তগো না কাটছি, তয় আমারও নাম ইছমাইল না!

ইসমাইলের রুদ্রমূর্তির সামনে আর দাঁড়াতে সাহস পায়নি তারা। তখনকার মতো চলে গিয়েছিল। তবে হুমকি দিয়ে গিয়েছিল যে দলবল নিয়ে আবার আসবে।

তিনি সে হুমকিকে পাত্তাও দেননি। রাতের বেলা তিনি আর রেশমাবিবি পালা করে বাইরের ঘরে রামদা আর ল্যাজা নিয়ে পাহারা দিতেন। আর ভিতরের ঘরে ভয়ে কাঁটা হয়ে দিন কাটাতো তিনটে মানুষ। বাচ্চাটা যখন তখন কেঁদে উঠতো বলে তার মুখে কাপড় গুঁজে রাখতো তার মা।

এমনভাবেই কেটে গেল কয়েকদিন। ততক্ষণে ওরা তিনজনেই বুঝতে পেরেছে যে এ দেশ ছেড়ে না গেলে আর রক্ষা নেই। দুষ্কৃতীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে হাজার হাজার মানুষ। বাকিরা দলে দলে দেশ ছেড়েছে।

ভাবলেই মনের ভিতরটা অবশ হয়ে আসে! আজন্ম পরিচিত এই মাটি ছেড়ে কোথায় যাবে? তাদের সমস্ত অস্তিত্ব তো এই মাটিতেই মিশে আছে!

তবু মা একদিন ইসমাইলকে বললেন

–তর ঘাড়ে বইস্যা আর কত খামু ইছমাইল? তর বোঝা হইয়া থাকতে ভালা লাগে না।

তিনি বিস্মিত, ব্যথিত হলেন–এইডা তুমি কইতে পারলা মা?তোমাগো ঘরে কত খাইছি, পরছি, মাখছি। দুখের দিনে সব ভুইলা যামু? আমারে কি তুমি নিমকহারাম ভাবলা!

মায়ের চোখে জল এলো। এত দুঃখের দিনে এমন আন্তরিকতা পেলে। সবারই কান্না পায়। তবু পরিস্থিতি মানুষকে শক্ত হতে শেখায়। মা কান্না চেপে বলেন–হেই কথা কই নাই। তুই আমার পোলারও বাড়া। আরেকখান কাম কইরা দে বাপ।

–হুকুম করো মা।

–আমাগো ও দ্যাশে যাওনের বন্দোবস্ত কর। মা কেঁদে ফেললেন–এ দ্যাশ এহন শত্রুর হইছে। এইহানে আর মন টিকে না।

ইসমাইলও বুঝতে পারছিলেন যে এভাবে বেশিদিন চলতে পারে না। রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেদিকে মোড় নিচ্ছে তাতে এ দেশ আর নিরাপদ নয়।

তবু মন মানে না! যুক্তি বুদ্ধির উপরও টেক্কা দেয় হৃদয়। ঈদের দিনে আর কেউ হাসিমুখে নেমন্তন্ন খেতে আসবে না,পুজো-পার্বণে কেউ

সহাস্যে পিঠে-পুলি বা ভাত-মাছ বেড়ে দেবে না–ভাবলেই বুকটা হু হু করে।

কিন্তু কষ্টটা বুকে চেপেই বললেন–জবান দিলাম মা। তাই হইবো।

বলেই আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছিলেন। পিছন থেকে মা ডাকেন–শোন্।

ইসমাইল থমকে দাঁড়ালেন।

–এইহানে আয়...আমার কাছে বয়...

তিনি বাধ্য ছেলের মত মায়ের সামনে বসে পড়লেন। মা তার মুখ দুহাতে স্পর্শ করেছেন। একদৃষ্টে সেই প্রশান্ত শাশ্রুগুফ আচ্ছাদিত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ জলে ভরে এসেছে। প্রচন্ড উচ্ছ্বসিত কান্নাকে চাপতে চাপতে দুহাতে তার মুখ ধরে বললেন–এ জনমে আমার একখানই দুস্ক রইলো ইছমাইল...। তোরে ক্যান্ আমি প্যাডে ধরি নাই বাপ.....!

ইসমাইল চোখ নীচু করলেন! সম্ভবত চোখের জল গোপন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য!

পরের দিন রাতের বেলায় মাছের ঢাকা গাড়িতে আঁশটে গন্ধ মাখা চুপড়ির সাথে রওনা হল তিনটে মানুষ আর একটি শিশু। গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলেন স্বয়ং ইসমাইল। পথে যদি কোনও বিপদ আসে সেজন্য হাতের কাছে অস্ত্রও রেখেছিলেন। কিন্তু সম্ভবত গাড়িটা ইসমাইল মিঞার বলেই কোনরকম বিন এসে উপস্থিত হল না। রাতের অন্ধকার মেখেই গাড়ি ছুটে চলল ভারত পূর্বপাকিস্তান সীমান্তের দিকে।

তিনটে ছিন্নমূল প্রাণ সব ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে এসে জুটল পশ্চিমবঙ্গে। এখানে প্রাণের ভয় নেই।

তার সাথে নেই সেই মাটির গন্ধ,পদ্মার সেই ছুটে চলা, সেই দিগন্তব্যাপী ধানের ক্ষেত, নেই করিমচাচা, সিরাজ, ইসমাইল ভাইজানরাও।

আর নেই সেই নাড়ির টান!

...আচ্ছন্ন দৃষ্টি বারবার তবু কি যেন খুঁজে বেড়ায়...!

কবেই তো সব শেষ হয়ে গেছে–তবু কী যেন অমোঘ টানে বারবার টেনে ধরে! পদ্মাপাড়ের হাওয়া আজ আর ত্রিসীমানায় নেই–তবু কোথাও যেন আজও হু হু করে বয়ে বেড়ায়! কবেই তো অতীত হয়ে গেছে, তবু কেন সেই দিগন্তবিস্ত ত মাঠ বারবার ফিরে আসে স্মৃতিতে...!

মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটা অনুভব করে অদ্ভুত একটা দুলুনি। এমন দুলুনি পদ্মা নদীর বুকে ভেসে চলা নৌকোগুলোয় চড়লে টের পাওয়া যেত। বড় সস্নেহে পদ্মা যেন কোলে তুলে দোলাচ্ছে!

নিঃশ্বাস নিতে বড় কষ্ট...আঃ...

...তখনও আদিগন্ত মাঠ রোদে ঝলমল করছে! ঘাসের বুকে ফোঁটা ফোঁটা তাজা স্বচ্ছ শিশির। ঝিলের বুকের সাদা শালুকের দল শিশিরে স্নান করেছে। কাশবন ঢেউয়ে ঢেউয়ে হাত নেড়ে ইশারায় বলে–আয়...আয়...।

...সেই মাঠের ওপ্রান্তে করিমচাচার বাড়ি। করিম চাচা খুব মন দিয়ে সজীবাগানটা দেখছিলেন। তাকে দেখতে পেয়েই সোৎসাহে বললেন–আইছো মনু?...আয়ো...আয়ো...

লোকটা আপনমনেই ঘোরের মধ্যে বিড়বিড় করে বলে–এই আসতাছি...

–কী বলছ?...কী বলছ বাবা?

সে চুপ করে গেল...

...তখনও চোখের সামনে সেই বিরাট মাঠ...সিরাজ পড়ি কি মরি করে দৌড়চ্ছে কাটা ঘুড়ির পিছন পিছন। খিলখিল করে হাসছে। আর চিৎকার করে বলছে–

–মিতা-আ-আ-আ...আমি নৌকা চালাইতে শিখছি। তুমি সনে ভেঁপু বাজাবা না? আইসো...শীগগির আইসো মিতা...

লোকটা ফের বলে–এই যাই.....

আশেপাশের মুখগুলো অবাক হয়ে এ ওর দিকে তাকায়। বিড়বিড় করে কি বলছে মানুষটা? এ কি বিকার!

–বাবা...কী বলছ?

...ঈদের দিন সকালে ইসমাইল ভাইজান একখানা পেল্লায় থলে নিয়ে এসে হাজির। হাসিমুখে চেঁচিয়ে বলছে–আমারে ছাইড়া যাইবা কই দাদাভাই? এই ঈদের নিওতা দিলাম। আইবা না?

সে আপন মনেই জবাব দেয়–আসুম।

–বাবা...বাবা...!

কয়েকমুহূর্তের জন্য যেন তার হুঁশ ফেরে। প্রচন্ড শব্দ করে শ্বাস টানতে টানতে বড় বড় চোখে এদিক ওদিক তাকায়।

–কিছু বলছ?

জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলার সাথে উঠে এল ভীষণ কাশি। একদলা কফ মুখের কষ বেয়ে পড়ছে। সেই অবস্থাতেই ঘড়ঘড় শব্দে উত্তর এল...

–আমারে ডাকে...

–কে ডাকে? কে ডাকে বাবা?

উদ্বিগ্ন মুখগুলো তার মুখের সামনে ঝুঁকে পড়েছে। সে দেখতেও পেল না। দুলুনি যেন ক্রমশ বাড়ছে। পদ্মা তাকে ঘুম পাড়াচ্ছে। চোখের পাতায় নেমে আসছে ঘুম। ঝাল্লা হয়ে যাচ্ছে সবুজ মাঠ, সোনালি ধানক্ষেত, রূপোলি রোদ্দুর.....

নিশ্ছিদ্র কালো সন্ধ্যা তার দু চোখে ডানা মেলে দিল। বুকের উপর দশমনি পাথর চাপানো! হাঁ করে নিঃশ্বাস টানার শেষ যুদ্ধ করতে করতে শেষ প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে গেল সে...

–বাবা? কে ডাকে তোমায়?

boierpathshala.blogspot.com

ক্ষীণ, অস্পষ্ট–প্রায় মিলিয়ে যাওয়া স্বরে সে ফিসফিস করে বলল—

–আ-মা-র...দ্যা-শ...!